স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

৭ম বর্ষ ❑ প্রথম সংখ্যা ❑ অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৭

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টেটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়, অথবা নিছক কৌতূহলের ব্যাবসা?

ক্লাবে ক্লাবে বা ডাক্তারদের আয়োজিত স্বাস্থ্যশিবিরে আপাতসুস্থ বাচ্চা থেকে বয়স্ক, সবার আঙুলের এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে স্ট্রিপ ও গ্লুকোমিটারের পরীক্ষা করে বলে দেওয়া হয়, ডায়াবেটিস আছে বা নেই। রোগীর ইতিহাস না নিয়ে, যে আসছে তারই রক্তপরীক্ষা করে, এরকম বলা কি যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানভিত্তিক?—লিখেছেন ডা. গৌতম মিস্ত্রী।

৪

উচ্চরক্তচাপের জটিলতা এড়াতে হলে

ছোঁয়াচে নয় এমন অসুখগুলোর মধ্যে উচ্চরক্তচাপ রোগে সারা পৃথিবী আক্রান্ত। এই রোগে ধমনীর দেওয়ালে দীর্ঘদিন ধরে রক্তের চাপ খুব বেশি থাকে, আর তা থেকে শরীরের নানা ক্ষতি হয়। সেটা এড়ানো সম্ভব, লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ।

১১

স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান বনাম সাম্প্রদায়িকতা

দেশজুড়ে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের বেহাল দশা। তাই মানুষের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের সর্বত্র। তারই মোকাবিলায় এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ—সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা নিয়ে লিখেছেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্লাস্টিক সার্জারির পৌরাণিক গালগল্প আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করেছেন আশীষ লাহিড়ী আর গোরক্ষার নামে এদেশে কত-যে শিশু অকালেই প্রাণ হারাচ্ছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

জিএসটি ও ওষুধের দাম

১ জুলাই থেকে অন্যান্য সমস্তরকম পণ্যের সঙ্গে ওষুধের ওপরেও জিএসটি প্রযোজ্য হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জিএসটি কী প্রভাব ফেলেছে ?জিএসটির জন্যে কি ওষুধের দাম আগের থেকে বেড়েছে? জিএসটির জন্যে বাজারে ওষুধ জোগান কি কমেছে? The Wire পত্রিকায় এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এস. শ্রীনিবাসন, ও টি. শ্রীকৃষ্ণ, তার অনুবাদ করেছেন ডা. অপূর্ব।

২৬

এ বিশ্ব কি এ শিশুর?

যেকোনো শিশুর মৃত্যু মানুষকে নাড়া দেয় বেশি। মানুষ তার অবচেতনে শিশুর মধ্যে নিজের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো আর মানবপ্রজাতির শৈশব দুটোই দেখতে পায়। অথচ দরিদ্রের জন্য নিরাপদ শিশুজন্ম বা শিশুর পুষ্টির ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি। আমাদের হাসপাতাল প্রায়শই শিশুবধ্যভূমি। অবস্থা বদলাতে গেলে যে নৈতিক মান যে সততা দরকার সেটা অর্জন করতে না পারলে শিশুমেধ চলবে, নিঃশব্দে, লিখছেন ডা. কৌশিক দত্ত ।

৫০

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়, অথবা নিছক কৌতূহলের ব্যাবসা	ডা. গৌতম মিস্ত্রী	৪
উচ্চরক্তচাপের জতিলতা এড়াতে হলে	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	১১
গোরুর Raw(র) চোনা	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	১৩
গজানন, অজানন, পরশুরাম, মেডাওয়ার	আশীষ লাহিড়ী	১৮
সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	২১
জিএসটি ও ওষুধের দাম	এস শ্রীনিবাসন ও টি শ্রীকৃষ্ণ	২৬
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন	২৯
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩০
আসুন সত্যিকারের স্বাধীন হই	রুমঝুম ভট্টাচার্য	৩৪
ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস	ডা. রাহুল মুখার্জি	৩৬
চামড়ার ছত্রাক সংক্রমণ-সমস্যা কি বাড়ছে?	ডা. জয়ন্ত দাস	৩৮
বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার	রুমঝুম ভট্টাচার্য	৪১
বন্যার জল কি শুধু ধ্বংসই করে?	ডা. সুমিত দাশ	৪৩
বস্তি জীবনে জনস্বাস্থ্য সমস্যা	ধ্রুবজ্যোতি দে	৪৫
এ বিশ্ব কি এ শিশুর?	ডা. কৌশিক দত্ত	৫০
দৃষ্টিকোণ		
আক্রান্ত চিকিৎসক, শূন্য বেসরকারি আউটডোর, কিছু অনিবার্য প্রশ্ন	ডা. বিষাণ বসু	৫২

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল	কলকাতার অন্যত্র
পাতিরাম	অমর কোলে স্টল (বিবাদি বাগ)
বুকমার্ক	এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
পিপলস বুক সোসাইটি	লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
বই-চিত্র	কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
মনীষা গ্রন্থালয়	বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট	দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
	জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭
ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।
সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315
সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান
এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

গৌরী লঙ্কেশ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭। এমএম কালবুর্গি, ৩০ আগস্ট ২০১৫। গোভিন্দ পানসারে, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। ডা. নরেন্দ্র দাভোলকার, ২০ আগস্ট ২০১৩।

কিছু কি মিল আছে এইসব মানুষের মধ্যে? কী বলতে চাইছে নামের পাশে বসানো এদের মৃত্যুদিনগুলো? প্রশ্নটা সহজ, আর উত্তরটাও জানা। খুব কাছ থেকে গুলি করে মারা হয় এদের। আর, অপরাধী ধরা পড়েনি কোনো ক্ষেত্রেই।

কিন্তু আসল মিল বোধহয় এখানেই যে এরা প্রত্যেকে ছিলেন চরম দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে। ভয়-দেখানো মানুষগুলোর কাছে, কুর্সিতে বসা বা না-বসা সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে, এরা দাসখত লিখে দেননি। সত্যিকে উদ্ঘাটন করেছেন। আজকালকের সত্যি, ইতিহাসের সত্যি। আর সত্যি কথাগুলো তো কোনো ধর্মের মুখোশে ঢাকা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই পছন্দ হবার কথা নয়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রতিটি মুহূর্তে ইতিহাসকে বিকৃত করে। বর্তমানকে বিষাক্ত করে তাদের মিথ্যা খবর রচনায়।

কিন্তু স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র মতো একটি স্বাস্থ্য-বিষয়ক পত্রিকা কেন এসব নিয়ে ভাববে? ইতিহাসের সত্যি বা বর্তমানের খবর নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা কেন? কেন আমরা গৌরী লঙ্কেশের মৃত্যুতে হিন্দুত্ববাদী শাসকদলের মানুষগুলোর সোশ্যাল মিডিয়ায় বর্বর উল্লাসধ্বনিতে ক্রুদ্ধ? কেন কালবুর্গি, পানসারে বা দাভোলকারের কথাগুলো আমরা বলতে চাই?

আমরা বলতে চাই এইজন্যই যে স্বাস্থ্যের সঙ্গে, মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার সঙ্গে, মানুষের চেতনার উন্নতি ওতপ্রোত। উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী হলেন এক ‘যোগী’। ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর হয়তো-বা মনে হল, ন্যায়বিচার ও ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায় ধর্মরাজ্যের যে ধারণাটি, সেটি এবার বাস্তবে দেখা যাবে। এই কুহকিনী আশাটিকে সামনে রেখে আরও ভালোভাবে ধ্বংস করা হতে লাগল মানুষের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগকে। স্বাস্থ্যশিক্ষা খাতে অভূতপূর্ব ব্যয়-সংকোচন করা হল। সরকারি হাসপাতালের খরচ কমানো আর দেদার সরকারি দলের মদতপুষ্ট দুর্নীতির ফলে এমন অবস্থা হল যে গোরখপুরের এক বড়ো সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন ফুরিয়ে অজস্র শিশু মারা গেল। তাদের অধিকাংশ জাপানিজ এনকেফেলাইটিস-এর শিকার, যে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে সরকারের জনস্বাস্থ্য নিয়ে চূড়ান্ত অবহেলা ও দুর্নীতির ফলে।

চরম দুঃখজনক এই শিশুমৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক তরজায় দেখা গেল, হিন্দুত্ববাদীরা সরকারের মূল কাজ, মানুষের জীবন-জীবিকা শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষার কথাগুলো বিতর্কের বাইরে ঠেলে দিচ্ছেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাধারণের মনে গেঁথে দিচ্ছেন, এগুলোর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল অন্য সম্প্রদায়কে জব্দ করা বা গোরুকে রক্ষা করা। গোরক্ষার জন্য গৌ সেবা আয়োগ-সচিব খুলে তাতে শাসকদলের নেতাদের গোশালার দেখভাল করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যুগপৎ দুঃখ ও মজার বিষয় হল যে, সেখানেও গোমাতা তাঁর স্বঘোষিত পুত্রদের হাতে রক্ষা পাচ্ছেন না। কিছুদিন আগে নিজের গোশালায় ৫০ টি গোরুর মৃত্যুর জন্যে বিজেপি এক নেতা গ্রেফতার হয়েছেন— সেটা দুর্নীতি-হিমশৈলের চূড়ামাত্রই হবে।

আমরা মানুষের স্বাস্থ্যকে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রচেষ্টাকে, সরকারি কর্মকাণ্ডের সফলতা বিচারের মাপকাঠি করতে চাই। সাম্প্রদায়িক হানাহানি সেখান থেকেই মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে, মানুষকে বর্বরতার সমর্থক করে তোলার চেষ্টা করছে। তাই আজ *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সাংবাদিক-সম্পাদক গৌরী লঙ্কেশের হত্যার বিরুদ্ধে, লিখতে বাধ্য হচ্ছে।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়, অথবা নিছক কৌতূহলের ব্যাবসা?

আপামর জনগোষ্ঠীর আপাত সুস্থ বাচ্চা-বুড়ো, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে ডায়াবেটিস নির্ণয়ের জন্য আঙুলের এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে স্ট্রিপ ও গ্লুকোমিটারের পরীক্ষা কতটা যুক্তিসঙ্গত? লিখছেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রি**।

সাতসকালে পাড়ার ক্লাবের ফুটবল টিমের গোলকিপার বঙ্কু টি-শার্টে নেয়াপাতি ভুঁড়িটি ঢেকে, নাভির বেশ নীচে একটা আনকোরা শর্টস পরে আমার সকালের কাঁচা ঘুম ভাঙাল। আমার রবিবারের সকালবেলার মিঠে ঘুম মাঠে মারা গেল। আমি চোখ কচলাতে কচলাতে ভালো করে চেয়ে দেখি বঙ্কুর সাথে বেজার মুখে আমারই মতো চোখ কচলাচ্ছে তার বউ আর দশ বছরের মেয়ে। 'কী ব্যপার' জিজ্ঞেস করতেই বঙ্কু বলল, স্যার আপনাদের সবার কথা ভেবে আজ ক্লাবে বিনে পয়সায় রক্ত পরীক্ষার আয়োজন করেছি। জাস্ট এক ফোঁটা রক্ত আঙুলের ডগা থেকে দেবেন, হাতে গরম--মানে সাথে সাথেই আপনার ডায়াবেটিস আছে কিনা জেনে নেবেন। আমি বললাম, ক্লাবটাকে হাসপাতাল করে ফেলেছ নাকি? বঙ্কু বলল, না না, তেমাথার ঐ নতুন 'ডায়াগনস্টিক সেন্টার', ওরা ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। ক্লাবের জন্য, মানে জনগণের জন্য, মানে সমাজের জন্য কিছু করার জন্য আমার নিবেদিতপ্রাণ স্যার, তাই জুটে যাই এইসবে। বুঝলাম, বঙ্কু এই সময়ের সবচেয়ে সহজ ও সফল রাস্তার হদিশ পেয়ে গেছে।

মাঝে মধ্যেই শোনা যায়, পাড়ার ক্লাব, চিকিৎসকদের স্থানীয় সংগঠনের শাখা বা ওষুধ বিপণনকারী সংস্থার স্থানীয় কর্তাদের বদান্যতায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিনে পয়সায় এমন কর্মকাণ্ড ঘরের কাছে অনুষ্ঠিত হলে তার আকর্ষণ এড়ানো কঠিন। নিখরচায় হাতে গরম পাওনাগণ্ডায় আমাদের বিশেষ প্রীতি; তাই ফাউয়ের পিছনের ফেউয়ের অদৃশ্য উপস্থিতি আমাদের চোখে পড়ে না। সকাল বেলা কোনোক্রমে নিজ দেহখান নিয়ে গেলেই আপনি একবারে সমবেত স্বেচ্ছাসেবীদের কেন্দ্রবিন্দুতে। কেউ একজন ব্লাড প্রেশার মেপে দিচ্ছেন তো আর একজন আঙুলে সুঁচ ফুটিয়ে নিমেষে রক্তের সুগারের মাপ বলে দিলেন। আপনি প্রায় জানতেনই আপনার ওসব কিছু খারাপ খারাপ রোগ হবে না, পার পেয়ে যাবেন। অবশ্য আপনি শেষ পাতে একটা মিষ্টি না খেয়ে পারেন না। আলসেমিতে সকালে হাঁটতে বেরোনো হয়ে ওঠে না। পুরানো জামা পালটে ঢোলা জামা পরতে হচ্ছে সদ্য গজিয়ে ওঠা ভুঁড়ি ঢাকার জন্য। পড়ন্ত যৌবনের কালও পেরিয়ে এসে এইসব পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো করতে একটু ভয় ভয় করলেও আপনার উপরে নির্ভরশীল নিষ্পাপ পরিবারের সদস্যদের দিকে চেয়ে আপনি ঢুকে পড়েন স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবিরে। কোনোমতে যদি স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকে আপনার 'সুগার', তবে আশঙ্কা মুহূর্তেই পরিণত হত উল্লাসে। যাক, এততেও যখন কিছু হয়নি, তাহলে . . . তাহলে আরও বেশ কিছুদিনের অস্বাস্থ্যকর সজ্ঞান উশৃঙ্খল জীবনশৈলীর লাইসেন্স রিনিউ হয়ে গেল! আপনার দিন দিব্যি কাটে আরও কিছুদিন।

এছাড়া এই অনিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের অন্য কোনো লাভ আছে কী? আপনার অনুমান আর আশাভরসায় ঠান্ডা জল ঢেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, এই পরীক্ষানিরীক্ষায় কোনো লাভ নেই কেবল তাই-ই নয়, কিছু ক্ষতি থাকতেও পারে।

একফোঁটা রক্তের বিনিময়ে একদম বিনে পয়সায় আপন রক্তের চিনির মাত্রা জেনে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেলে ভালোই তো? না, ভালো নয় মোটেই।

আমাদের গণ-উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার একটা কারণ অবশ্য আছে। উচ্চ রক্তচাপ আর ডায়াবেটিস এই দুই নিঃশব্দ ঘাতকের কথা আজকাল একটু কান পাতলেই শোনা যায়। খবরের কাগজে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনে, পাড়াপড়শির রোগভোগের বাড়বাড়ন্ততে , ডাক্তারের সাবধানবাণীতে একটা আতঙ্ক মনে বাসা বাঁধে। সরকারি স্বাস্থ্যবীমার এজেন্ট বলে গেছেন, ডায়াবেটিস ছুঁয়ে দিলে বীমা হবে না। ব্লাড প্রেশারের রোগ থাকলে হার্টের রোগের চিকিৎসায় বীমা কোম্পানি এক পয়সা দেবে না। এটাও শোনা যাচ্ছে, ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করে ফেলেছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। আমেরিকায় এ রোগ

আমাদের চাইতে কম, কিন্তু সেখানেই স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের ১৪ শতাংশ খরচ কেবল ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যয় হয়। এর মধ্যে অর্ধেক ব্যয় হয় হার্ট অ্যাটাক, মস্তিষ্কের স্ট্রোক, অকেজো কিডনি, অন্ধত্ব আর পায়ের ক্ষতের রোগের চিকিৎসার জন্য। খোদ আমেরিকার মোট ডায়াবেটিসের ২৫ থেকে ৪০ শতাংশের রোগ নির্ণয়ই হয় না। তৎসত্ত্বেও ওদেশে মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশের ডায়াবেটিস রোগ নির্ণীত হয়। আমাদের দেশে এই সংখ্যাটা আনুমানিক ৯ থেকে ১০ শতাংশ আর অনির্ণীত ডায়াবেটিসের বোঝা প্রায় ৫০ শতাংশ।[১-৪] প্রথমের কয়েকটা বছরে ডায়াবেটিস গোপনে বাড়ে, কোনো রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। অথচ ডায়াবেটিস রোগে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতিসাধনের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যায় প্রথমেরও আগে থেকে। ডায়াবেটিস রোগে একটা প্রস্তুতি পর্ব আছে, যার গালভরা নাম, ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা বা "প্রি-ডায়াবেটিস"{Increased risk for diabetis, Impaired fasting glucose (IFG), Impaired glucose tolerance (IGT)}। হৃদরোগের সূত্রপাত এই "প্রি-ডায়াবেটিসের" সময়ে থেকেই শুরু। অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ শরীরে আস্তানা গাড়লে তার সত্বর নির্ণয় প্রয়োজন, অথচ প্রায় ৫০ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগ ইহজীবনে অনির্ণীত থেকে যায়।[৩,৪]

বিভিন্ন ধরনের ডায়াবেটিস রোগের মধ্যে ইনসুলিনে অসংবেদনশীল (insulin resistant) বা দ্বিতীয় প্রকারের (টাইপ ২, Type 2) ডায়াবেটিসই ৯০ শতাংশ, যেটি নিয়েই আমাদের এই আলোচনা। সংক্ষেপ করার জন্য এখন থেকে ডায়াবেটিস নিয়ে যা যা বলব সবই এই প্রকার ডায়াবেটিসের কথা, সেটা বুঝে নেবেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস প্রথমের দিকে নীরবে শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতিসাধন করতে থাকে, টের পাওয়া যায় না। হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, কিডনি অকেজো হয়ে যাওয়ার রোগ, চোখের রেটিনার রোগ আর দুরারোগ্য পায়ের রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ার ক্ষতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫] উন্নত দেশের স্বাস্থ্যখাতে খরচের একটা বড়ো অংশ ব্যয় হয় ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়। কর্মক্ষেত্রে গরহাজির, উৎপাদনশীলতা হ্রাস, কাজ থেকে ছাঁটাই ইত্যাদিও ডায়াবেটিসের পরোক্ষ ক্ষতি।[৬] অর্থাৎ, ডায়াবেটিস রোগ শহুরে ও মফঃস্বলের মেদভারে ভারাক্রান্ত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মাথাব্যথার একটা ন্যায্য কারণ বটে। আশেপাশে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কারোর ডায়াবেটিস হবার খবর পেলেই তাই বুকটা কেঁপে ওঠে। তাই বাড়ির পাশে, পাড়ায় ক্লাবে বা অফিস-কাছারিতে একফোঁটা রক্তের বিনিময়ে একদম বিনে পয়সায় আপন রক্তের চিনির মাত্রা জেনে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেলে ভালোই তো? না, ভালো নয় মোটেই। এতে আমার আপনার কী সুবিধা-অসুবিধা তার প্রমাণ-নির্ভর খবরাখবর জেনে নাওয়া যাক। এই সুযোগে আমরা 'টাইপ - টু' বা 'ইনসুলিনে অসংবেদনশীলতার' কারণে যে ডায়াবেটিস হয়, যেটা কিনা আবার মোট ডায়াবেটিসের নব্বই শতাংশেরও বেশি, সেটার যথাযথ নির্ণয়ের উপায় নিয়ে আলোচনাটাও করে নেব।

তাড়াতাড়ি রোগ ধরা দরকার টাইপ টু ডায়াবেটিস (আলোচনা সহজ করার খাতিরে আমরা এই নিবন্ধে কেবল ডায়াবেটিস বলেই উল্লেখ করব) রোগের উপস্থিতির নির্ণয় যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি করা উচিত মোট পাঁচটি কারণে

১. এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যা।

২. এই রোগের শুরুর দিকে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোনো রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না।

৩. এই রোগ নির্ণয়ের সহজ ও সস্তা উপায় আমাদের হাতের মুঠোয় আছে।

৪. রোগ নির্ণীত হলে এই রোগের সর্বজনগ্রাহ্য চিকিৎসাও আছে।

৫. রোগলক্ষণ না থাকলেও রোগের শুরুর দিকে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগ করে কর্মক্ষম দীর্ঘ জীবন উপভোগ করা সম্ভব।

সকালবেলায় সপরিবার বন্ধু খালিপেটেই ছিল। আমার এইসব কথার সারাংশ শুনে দুশ্চিন্তায় সে প্রায় তখনি আধমরা, তাড়াতাড়ি একফোঁটা রক্ত দিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে সে প্রায় ছুটে যায় আর কি। আমি বললাম দশ মিনিট পরে স্থির করো। ডায়াবেটিস নির্ণয়ের সাতকাহন শুনেই যাও না কেন? যদিও উপরের কথাগুলো একদম সত্যি, প্রমাণ নির্ভর, তবে এর মধ্যে কিঞ্চিৎ অজানা জটিলতা আছে।

বহু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এটা জানা যায়নি স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করে এরকম আপাত সুস্থ মানুষের ডায়াবেটিস নির্ণয় দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দেয় কিনা। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ, চিকিৎসক, সমাজসেবী, সরকার বাহাদুর মায় বৈজ্ঞানিকমহল এর সত্বর রোগ নির্ণয়ে সঙ্গত কারণেই বেশ মাথা ঘামিয়ে থাকেন। ডায়াবেটিস রোগের শুরুর দিকে, শরীরে রোগ নীরবে বাসা বাঁধলেও সময় নষ্ট না করে যথাযথ চিকিৎসা শুরু করা দরকার, এ নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে সংশয় আছে আপাত-সুস্থ মানুষের ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি নিয়ে। সর্দিকাশি, আমাশা বা খোসপাঁচড়া হলে তার রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার জন্য বৃথা বিলম্বের সমস্যা নেই, কারণ এই সব রোগভোগে চিকিৎসা পরিষেবা বা ওষুধপত্রের জোগানের সমস্যা হতে পারে, কিন্তু রোগ নির্ণয়ের বা চিকিৎসার প্রয়োজন উপলব্ধির সচেতনতা চিকিৎসার অন্তরায় নয়।

এই অবধি বলা পর্যন্ত বন্ধুর ভ্রূ-র ওঠানামা দেখছিলাম। বললাম, বন্ধুভায়া কিছু বলবে মনে হচ্ছে। বলল, এই হচ্ছে আপনাদের দোষ, কথার মারপ্যাঁচে কী যে বলেন বোঝা মুশকিল। এই বললেন ডায়াবেটিস কোনো কষ্ট না দিয়েই গোপনে গোকুলে বাড়ে, আবার এও বললেন, ডায়াবেটিসের সত্বর নির্ণয় করে তার চিকিৎসা শুরু করা চাই। সেই জন্যেই তো কষ্ট থাকুক আর নাই থাকুক রক্ত পরীক্ষা করে সেটা দেখে নিলে ক্ষতি কী?

—ক্ষতিটা দু-রকমের, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কথাটা আগে খতিয়ে দেখা যাক। যে কোনো উদ্যোগ, বা খরচ-খরচার ব্যাপারে আমাদের বোধগম্য সহজ সরল পাটিগণিতের

হিসেবের অঙ্কের পেছনে গোপন থাকে উত্তর-না-জানা হিসেব, আর থাকে হিসেব জানা সুগভীর চক্রান্তের জটিল হিসেবনিকেশ। আমরা চক্রান্তের হিসেবের বিষয়টা আপাতত মুলতুবি রেখে আলোচনাটিকে যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করব। সোজা হিসেবটা হল, ডায়াবেটিস রোগের অস্তিত্ব নিরূপণ বেশ সোজাসাপটা—খালিপেটে, খাবার দু-ঘণ্টা বাদে, অথবা খাবার সময় নিরপেক্ষভাবে (র‍্যান্ডম) রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করলেই সেটা করা যাবে। তবে এ হল পুকুরে মাছ ধরার মতো ব্যাপার। ছিপ ফেললেও মাছ ধরা দেবে, আবার জাল ফেলেও সেটা করা যাবে। সমাজ যদি পুকুর হয় আর মাছ যদি ডায়াবেটিস হয় তবে বঙ্কুর ক্লাবে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় শিবির হল ছিপ ফেলে মাছ ধরার সখের টাইম-পাস। ওতে মৎস্য-শিকারির সাধ-আহ্লাদ পূরণ হয় বটে, পুকুরের অনেক মাছ অধরাই থেকে যায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতির এই রোগনির্ণয়ের সম্ভাবনা পার্থক্যের নাম 'সেন্সিটিভিটি'। কোনো রোগ নির্ণয় পদ্ধতি জনগোষ্ঠীর উপরে প্রয়োগ করলে যদি নির্ভুলভাবে সব রোগগ্রস্ত মানুষের রোগের উপস্থিতি সফলভাবে নির্ণয় করতে পারে (যদিও কিছু সুস্থ মানুষের রোগ আছে, এমন ভুল সেই রোগ নির্ণয় পদ্ধতিটি করে), তবে সেই রোগ নির্ণয় পদ্ধতিকে একশো শতাংশ 'সেনসিটিভ' বলা যাবে। এই সঙ্গে রোগ নির্ণয় পদ্ধতির আরও একটা সম্ভাবনা মনে রাখতে হবে, যেটাকে 'স্পেসিফিসিটি' বলা হয়ে থাকে। কোনো রোগ নির্ণয় পদ্ধতি একশো শতাংশ স্পেসিফিসিক মানে, সেই পদ্ধতিতে কোনো সুস্থ মানুষকে রোগগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হবে না। তা, রোগের উপস্থিতির গোয়েন্দাগিরিতে একশো শতাংশ সেনসিটিভ ও একশো শতাংশ স্পেসিফিসিক পদ্ধতি নেই। অন্তত আট ঘণ্টা অভুক্ত অবস্থায় আঙুলের একফোঁটা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিরূপণ করে ডায়াবেটিসের আছে কিনা, সে বিচার করা অসম্ভব। কেন অসম্ভব সেটা আলোচনা করা যাক।

বৈজ্ঞানিকগণ এটা অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছেন, কোনো রোগের অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য মাপক পদ্ধতি প্রয়োজন যেটাকে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে সর্বোত্তম ও যথাসম্ভব নির্ভুল বলে মনে করা হয়। এযাবৎ আবিষ্কৃত রোগ নির্ণয়ের স্বীকৃত পদ্ধতির মধ্যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে এই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হল খালি পেটে ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে দুঘণ্টা নিষ্কর্মা বসে থেকে পরীক্ষাগারে (গ্লুকোমিটারে স্ট্রিপ দিয়ে নয়) রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করা। সেটা (গ্লুকোজ) রক্তের প্রতি ১০০ মিলিমিটারে (এক ডেসিলিটারে) ২০০ মিলিগ্রাম বা তার বেশি হলে শীঘ্র আর একবার ঐ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার একটা আবশ্যিক পর্যায় আছে। তবেই মোটামুটি একশো শতাংশ নিশ্চিতভাবে (প্রায় ১০০% সেন্সিভিটি) কারোর ডায়াবেটিস আছে এটা বলা যাবে। এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মাত্রা রক্তের প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ মিলিগ্রামের কম। প্রতি ডেসিলিটারে ১৪০ থেকে ১৯৯ মিলিগ্রাম হলে সেই অবস্থাকে মাঝামাঝি, বা ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা (প্রি-ডায়াবেটিস, বা ইম্পেয়ার্ড গ্লুকোজ টলারেন্স) বলা যাবে। খালি পেটে রক্তের সুগার মেপে ডায়াবেটিস কি ডায়াবেটিস নয় তা বলতে গেলে সত্যিকারের (গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে নির্ণীত) ডায়াবেটিসের অনেকজন ভুল ভাবে 'সুস্থ' বলে চিহ্নিত হয়ে যাবেন।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ে তিনটি পরীক্ষা

সুস্থ ব্যক্তির যে তিনটি পরীক্ষা ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল—

১. ন্যূনতম আট ঘণ্টা অভুক্ত (কেবল খাবার জল পান করা চলবে) থেকে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (Fasting blood glucose, FBG) ১২৬ অথবা তার বেশি (≥126 mg/dL (7.0 mmol/L)

২. খালি পেটে ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খেয়ে দু-ঘণ্টা নিষ্কর্মা বসে থেকে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা (Oral Glucose Tolerance Test, OGTT) প্রতি ১০০ মিলিমিটারে ২০০ মিলিগ্রাম অথবা তার বেশি (≥200 mg/dL (11.1 mmol/L)

৩. 'গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন' (glycated haemoglobin, HbA1C), এর মাত্রা ৬.৫% অথবা তার বেশি।

এই তিনটি রোগ নির্ণয় পদ্ধতির যেকোনো একটি অস্বাভাবিক হলেই ডায়াবেটিস রোগের অস্তিত্ব আছে মনে করা হয়, তবে পরীক্ষাটি দ্বিতীয়বার করে অস্বাভাবিকতা নিশ্চিত করে নিতে হবে। তবে প্রথম ও তৃতীয় উপায় দুটির সত্যিই কতটা সঠিকভাবে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় করতে পারছে সেটা 'জনগোষ্ঠী'-র উপরে নির্ভর করে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি (OGTT) অপেক্ষাকৃত জনগোষ্ঠী-নিরপেক্ষ এবং এই পদ্ধতিকে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' ধরে নিলে প্রথম পদ্ধতির (FBG) সঠিক রোগ নির্ণয় ক্ষমতা (স্পেসিফিসিটি, রোগ নিরূপিত হলে সেটা নির্ভুল হবার সম্ভাবনা) ৯৫ শতাংশের বেশি। কিন্তু, ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা তেমন বেশি নয় এমন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগীর মাত্র ৫০ শতাংশের রোগ খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করে ধরা পড়বে (৫০% 'সেন্সিভিটি')। অর্থাৎ ছেলে-বুড়ো, রোগা-মোটা, অলস বা শারীরিক পরিশ্রম করেন, পরিবারে ডায়াবেটিসের রুগী আছেন বা নেই—এসব বৈশিষ্ট্য যদি খতিয়ে না দেখি, সবার খালিপেটে রক্তের গ্লুকোজ মাপি, তাহলে ডায়াবেটিস রোগীর মাত্র অর্ধেকের রোগ ধরা পড়বে। সেই কারণে ও অন্য কিছু কারণে প্রথম পদ্ধতিটি (খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ মাপা) গণহারে আপাত-সুস্থ ব্যক্তির ডায়াবেটিস রোগ আছে কিনা সেটা ধরার কাজে স্বীকৃত পরীক্ষা নয়।[৭] একইরকমভাবে তৃতীয় পরীক্ষা ('গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন') ৭৯ শতাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল রোগ নির্ণয় করে (স্পেসিফিসিটি) আর ৪৪ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ থাকলেও বাছাই না করা জনগোষ্ঠীর ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ে অক্ষম ('সেন্সিভিটি') ।[৮] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রস্রাবের গ্লুকোজের মাত্রা নিরূপণ ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ে আরও অকাজের।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় কালে একজন মানুষ তিনটি শ্রেণির মধ্যে

একটিতে পড়বেন—(১) স্বাভাবিক, (২) ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ও (৩) এই দুইয়ের মধ্যবর্তী 'প্রি-ডায়াবেটিস' বা ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা। এই তিন ধরনের শ্রেণির ঠিক কোনটায় একজন মানুষকে ফেলা হবে সেটা তাঁর এই তিনরকম রক্তপরীক্ষার ফল নিয়ে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে তিনটে পরীক্ষার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশিরকমের অস্বাভাবিক, সেটিই গ্রাহ্য হবে এবং পরীক্ষাটির অস্বাভাবিক ফল দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।

চোখ বড়ো বড়ো করে বন্ধু শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর বেমক্কা প্রশ্ন। এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো কী আকাশ থেকে পড়ল? আমি বুঝলাম, বন্ধু মন দিয়ে শুনছিল। বললাম, তা কেন হবে? স্বাভাবিক মাত্রা নিরূপণের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বই কী। দেখা গেছে, ডায়াবেটিসের মূল ক্ষতি দু-রকমের—(১) আণুবীক্ষণিক রক্তনালীর ক্ষতিতে (microvascular complication)—যার জন্য চোখের রেটিনার রোগে অন্ধত্ব, স্নায়ুর রক্তনালীর রোগে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্নায়ুর কাজকর্মে ব্যাঘাত আর বৃক্ক বা কিডনির রক্তনালীর রোগে কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস। (২) অপেক্ষাকৃত মোটা রক্তনালীর ক্ষতিতে (macrovascular complication) হৃদয়, মস্তিষ্ক আর পায়ের রক্তচলাচলের বাঁধা। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে বিভিন্নভাবে মাপা রক্তের গ্লুকোজের (বা গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন-এর) মাত্রার সরাসরি সম্পর্ক আছে। ডায়াবেটিসের জন্য এইসব রোগ কখন শুরু হবে আর কীভাবে এগোবে, সেটা রক্তের গ্লুকোজের ওপর নির্ভর করে। আবার কতটা রক্তের গ্লুকোজ (বা গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন) হলে চিকিৎসা করতে হবে, আর ঠিক কোন মাত্রায় রক্তের গ্লুকোজ ইত্যাদি রাখলে বিপদ কম, সেটাও খুব হিসেব-নিকেশ করে বের করা হয়েছে। এই মাত্রাগুলি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার ফসল ও সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত।

বন্ধু বলে, তা হলে আট ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পরে তারপর ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার দু-ঘণ্টা পরে রক্তের গ্লুকোজ মাপাই তো সবচেয়ে কাজের। আমি বললাম, তা বটে, তবে সেই পরীক্ষা বড়ো ঝকমারির আর গ্লুকোজের দামটা অতিরিক্ত লাগে বলে সেটাও খরচ-প্রাপ্তির (cost-effectiveness) নিরিখে আপাত সুস্থ জনগোষ্ঠীর উপরে প্রয়োগযোগ্য নয়। "তাহলে কী বলতে চান"— বন্ধু এবারে অধৈর্য।

পরীক্ষানিরীক্ষার ঠিকভুল ও তার মাপ

"আমার শেষ বক্তব্য আগে বললে কারণটা স্পষ্ট হত না, যুক্তিহীন বাণী মনে হত। যেকোনো ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষার কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে। কেবল রোগ আছে বা নেই এই জ্ঞান বাড়ানোর জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতে পারে, ব্যাবহারিক ভাবে রোগী বা কষ্টহীন মানুষের রোগের অস্তিত্ব নির্ণয় করা চলে না। কোন রোগ নির্ণয় প্রক্রিয়া প্রয়োগের আগে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে কিনা দেখে নিতে নয় সেগুলি হল:

১. পরীক্ষাটি যথেষ্ট নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম, অর্থাৎ ভুলভাবে পরীক্ষার ফাঁক গলে কোনো রোগী সুস্থ বলে পার পেয়ে যাবে না (সেন্সিটিভিটি) আবার সুস্থ মানুষ রোগী বলে চিহ্নিত হবে না (স্পেসিফিসিটি)।

২. সেই পরীক্ষায় রোগ নির্ণীত হলে তার উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকার আছে শুধু তাই নয়, রোগলক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগে ও আপাত সুস্থ অবস্থায় রোগ নির্ণীত হবার জন্য সেই মানুষটির প্রয়োজনীয় সফল চিকিৎসাও থাকতে হবে।

৩. এই রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকারের কর্মকাণ্ড জনগোষ্ঠীর উপরে 'খরচ-প্রাপ্তির' (cost-effective) হিসেবে ঠিক আছে। অর্থাৎ, জনগোষ্ঠীর জন্য যে খরচ করা হচ্ছে তাতে আখেরে তার চাইতে বেশি লাভ পাওয়া যাবে।

আপাতভাবে সুস্থ জনগোষ্ঠীর ডায়াবেটিসের অস্তিত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অনেক বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন, ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বেশি এমন বাছাই করা মানুষের শ্রেণির আট ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পরে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করা কাজের।"

"বন্ধু, মনে কর তোমার ডায়াবেটিস আছে, কিন্তু সাতসকালে আঙুলে সুঁচের ছোবল সেটা নির্ণয় না করতে পারল না। এতে তোমার ক্ষতি না লাভ?"

বন্ধু যখন উত্তরের খোঁজে মাথা চুলকাচ্ছে আমি বললাম, ৫০% সেন্সিটিভিটি মানে বোঝো? এর মানে হল, ঘটনাচক্রে তোমার রক্তের সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক হলেও এই অর্ধসত্য স্বাভাবিক রক্তের রিপোর্ট তোমার ক্রমবর্ধমান ভুঁড়ি আরও বাড়ার ইন্ধন পেয়ে যাবে। আজ না হোক, আগামীদিনে তোমার ডায়াবেটিসের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতঃভ্রমণে চড়ার উৎসাহ কমবে, চায়ে চিনিও থাকবে, শেষ পাতে একটা মিষ্টি খাবার নানা অজুহাত বেরিয়ে যাবে। এটা নিঃসন্দেহে স্ফূর্তি করার বিষয় নয়।

আমি যদি সত্যিই ডায়াবেটিসের হাত থেকে বজ্রদৃঢ় সুরক্ষা চাই, তবে কী করতে হবে? এটা মোটেই কোনো গোপন বিদ্যা নয়। আমরা সকলেই কমবেশি জানি। ওজন নিয়ন্ত্রণ, মিষ্টি ও ভাজা খাবারে বিতৃষ্ণা জন্মানো দরকার। দৈনিক তিন থেকে পাঁচ কিলোমিটার হাঁসফাঁস করতে করতে জোর কদমে হাঁটা বা দৌড়ানো প্রয়োজন। এটা করতে পারলে, ওজন নিয়ন্ত্রণ করে দেহভর (বডি মাস ইনডেক্স) ২৩ প্রতি বর্গ মিটারে কিলোগ্রামে বেঁধে রাখতে পারলে আর নাভি বরাবর পেটের বেড় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে ৯০ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৮০ সেন্টিমিটারের মধ্যে সীমিত রাখতে পারলে ডায়াবেটিসের ভয় নেই, যদি তোমার পরিবারে ডায়াবেটিসের প্রাদুর্ভাব না থাকে। আর এরকমটি না হলে, ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকছেই।

একনজরে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কীসে কীসে হবে: (১) বয়স ৪৫ বছরের বেশি, (২) মোটা (বডি মাস ইনডেক্স প্রতি বর্গমিটারে ২৩ এর বেশি), (৩) এক প্রজন্ম আগে বা পরে পরিবারে ডায়াবেটিসে

আক্রান্ত মানুষ আছেন (৪) অলস ও শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক, (৫) মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় সাময়িক সময়ের জন্য ডায়াবেটিস নির্ণীত হয়েছে (সাধারণত প্রসবের বেশ কয়েক বছর পরে থাকে না), (৬) উচ্চ রক্তচাপের রোগ আছে (৭) রক্তে গুরু-ঘনত্বের (High density cholesterol, HDL) কোলেস্টেরল প্রতি ডেসিলিটারে ৩৫ মিলিগ্রামের কম অথবা/এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ২৫০ মিলিগ্রামের বেশি, (৭) পলিসিস্টিক ওভারি, (৮) আগে সংঘটিত যেকোনো রক্তনালীর রোগ।

"বন্ধু, তোমার এসব কিছু থাকলে অবশ্যই এই ফ্রি চেক আপটা করে নিতে পার।" বন্ধু বলে— এ তো বড়ো খটমট ব্যপার দাদা! আমি বললাম তা বটে, তবে এমন ধারা ডাক্তারি পরীক্ষানিরীক্ষার দায়ভার তোমাকেই বা কে নিতে বলেছে? এ জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, বিশেষজ্ঞদের বানানো নির্দেশাবলি আছে। তোমার কাজ হল স্বাস্থ্যসম্মত জীবনশৈলী অনুসরণ করা। যদি জ্ঞান বাড়াতে চাও, তো বলি ব্যক্তিবিশেষের সুরক্ষার জন্য অন্যরকম হিসেব-নিকেশ যার সঙ্গে অধিক প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষার কাজটি কেবল বাদ পরে যাবে না, অবহেলিত থেকে যাবে। ব্যক্তিবিশেষের ডায়াবেটিসের রোগসম্ভাবনা নির্ণয়ের জন্য অজস্র সরল পাটিগণিত আছে যেটাকে বিশেষজ্ঞরা 'রিস্ক স্কোর' বলেন। একটু আগে উল্লেখ করা ছ-সাত ধরণের ঝুঁকির বৈশিষ্ট্যের প্রতিটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেগুলোকে একত্র করে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বেশি হলে সেইমতো বাছাই করা জনগণের 'পরে 'আট ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পরে রক্তের গ্লুকোজ মাপার জাল ফেলে' ডায়াবেটিসের অস্তিত্ব নির্ণয়ের নিদান দিচ্ছেন সমাজ-সচেতন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা।[১০-১৩] এই রকম একটি ঝুঁকি নির্ণয় প্রক্রিয়ার নাম 'ফিনরিস্ক, FINRISK' যেটাতে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা নির্ণয় করা হয় ব্যক্তির বয়স, দেহভর, পেটের বেড়ের মাপ, উচ্চরক্তচাপের অস্তিত্ব, একপ্রজন্মের আগে পিছে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির অস্তিত্ব, পূর্বে প্রি-ডায়াবেটিস নির্ণয়ের অস্তিত্ব ইত্যাদির হিসেবনিকেশ থেকে।[১৪] বন্ধুর ছানাবড়া মার্কা চোখ দেখে বললাম, এমনভাবে বাছাই করে যদি পাড়ার বা ক্লাবের সদস্যদের ডায়াবেটিসের রোগ নির্ণয় করতে হয় তবে তুমি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে যেতেই পার, তোমার পরিবারকে রেহাই দিলে ক্ষতি নেই। আমাকেও রেহাই দিতে পার।

ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় শিবিরের কার্যকারিতা

এরকম ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় শিবিরের কার্যকারিতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে বিস্তর। কিন্তু এতে করে ডায়াবেটিসের ক্ষতি (microvascular and macrovascular complications) আটকানো গেছে এমন প্রমাণ নেই । দু- হাজার পনের সালে দু-টি সমীক্ষায় সম্মিলিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি সমীক্ষায় "ডায়াবেটিস-রোগের-অস্তিত্ব-নির্ণয়-শিবিরের" ফলাফল দীর্ঘ দশ বছর ধরে অনুধাবন করে দেখা গেছে, যাদের এই শিবির ডায়াবেটিস বলে চিহ্নিত করেছে আর যাদের তেমন করেনি, পরে অন্যভাবে ডায়াবেটিস রোগ নির্ণীত হয়েছে এই দুই শ্রেণির ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষতির নিরিখে অন্তিম ফলাফলে কোনো ফারাক নেই।[১৫] এই বিষয়ে ব্রিটেনের ৩৩টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৫৪০৮ ব্যক্তিদের নিয়ে সঙ্ঘটিত এক বড়ো সমীক্ষায় বয়স, লিঙ্গ, ওজন, ধূমপান, উচ্চরক্তচাপ, স্টেরয়েডের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যওয়ালা (যেগুলো ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বাড়ায়) ব্যক্তিদের তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে এই ক্লাবের মতো করে ডায়াবেটিস নির্ণয় করে তাদের ডায়াবেটিস, প্রয়োজন অনুযায়ী রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের সর্বোত্তম চিকিৎসা শুরু করা হয়, দ্বিতীয় ভাগের ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস নির্ণয় করে তাদের কেবল পরীক্ষার ফল জানিয়ে দিয়ে চিকিৎসা পরিষেবার দ্বারস্থ হবার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় আর তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিদের শিবিরের রক্ত পরীক্ষাই করা হয় না। গড় ৯.৬ বছর ধরে সীমিতভাবে সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তিম পরিণতি নজদারি করে ডায়াবেটিস সম্পর্কিত মৃত্যু, হৃদ্‌রোগে মৃত্যু, ক্যান্সারে মৃত্যু অথবা অন্য যেকোনো কারণে মৃত্যুর কোনো উল্লেখযোগ্য ফারাক এই তিন ভাগের মধ্যে দেখা যায়নি। ডায়াবেটিসের মৃত্যুই একমাত্র বিবেচ্য পরিণতি নয়, অন্ধত্ব, কিডনির ও হৃদ্‌রোগের প্রাদুর্ভাবের তথ্য অবশ্য এই সমীক্ষায় জানা যায়নি।[১৬] আসলে ডায়াবেটিসের রোগ নির্ণয় শিবিরের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করাই হয়নি। ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় শিবিরের কার্যকারিতা ও উপকারিতা প্রমাণের অভাবে এই কর্মকাণ্ডের কোনো মান্যতা নেই। বরং ডায়াবেটিস রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে আর এই ধরনের পরীক্ষায় রোগ ধরা না গেলে (যেটা হবার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি) আরও বিছুদিন, মানে আরও কয়েকটা বছর উশৃঙ্খল জীবনযাপনের ছাড়পত্র হাতে এসে যায় যতদিন না আবার এমনি একটা ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের শিবিরে জালে আটকে যাওয়ার দুর্ভাগ্য ঘটে।

বন্ধুরা অবশ্য এত কিছু বুঝতে নাও পারে। কিন্তু যদি বোঝেও তবে মরিয়া হয়ে হয়তো সওয়াল করে, ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয় পরীক্ষা এমন কি আর দামি? এত হিসেবনিকেশ না করলেই নয়! আমি বলব, তুমি কস্ট-এফেক্টিভনেস বিশ্লেষণের কথা বলছ। দেখা গেছে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর মাঝবয়সের ব্যক্তিদের (৩০ থেকে ৪৫ বৎসর বয়স) এই পরীক্ষা খরচ-প্রাপ্তির অনুকূল। এর চেয়ে কম বয়সে উদ্যোগ ও রসদের অপব্যবহার হবে। আর বেশি বয়সে করলে রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসা প্রয়োগে দেরি হয়ে যাবে। উচ্চরক্তচাপ বা মেদবহুল চেহারা থাকলে তাদের বাছাই করে পরীক্ষা করলে বোধহয় উদ্যোগ আর রসদের সঠিক ব্যবহার হবে। এবিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কী নির্দেশিকা দিচ্ছেন?

আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন বলছে মেদবহুল চেহারার সঙ্গে (আমেরিকানদের জন্য দেহভর প্রতি বর্গমিটারে > ২৫ কিলোগ্রাম, আমাদের ক্ষেত্রে ২৩) এক বা একাধিক ডায়াবেটিস রোগ হবার উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য (যেমন, রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কারোর ডায়াবেটিস রোগ

আছে বা একদম চেয়ার বা সোফা ছেড়ে নড়েন-চড়েন না) থাকলে প্রতি তিন বছর অন্তর ডায়াবেটিসের অস্তিত্ব নির্মূলের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আর সেটা নির্ণয় করতে হবে এই তিনটি পরীক্ষার যেকোনো একটি করে — (১) আট ঘণ্টা খালি পেটে থেকে রক্তের গ্লুকোজ মেপে (FBG), (২) আট ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পরে তারপর ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাবার দু-ঘণ্টা পরে রক্তের গ্লুকোজ মেপে (OGTT) অথবা (৩) যেকোনো সময়ে রক্তের 'গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন' (HbA1c) মেপে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা না স্বাভাবিক সেটার শ্রেণিবিভাগ সারণি অনুযায়ী হবে। উনিশশো পনেরো সালে আমেরিকার রোগ প্রতিরোধক নির্ণায়ক সংস্থা (US Preventive Services Task) নির্দেশিকা জারি করে ৪০ থেকে ৭০

সংশয় আছে আপাত-সুস্থ মানুষের ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি নিয়ে।

বছরের মধ্যে যারা মোটা, ডায়াবেটিসের রোগলক্ষণ নিরপেক্ষভাবে তাদের ডায়াবেটিস আছে কিনা প্রতি তিন বছরে সেটা নির্ণয় করা উচিত। কানাডার রোগ প্রতিরোধকারী সরকারি সংস্থা আমেরিকার স্বীকৃত সংস্থার মতোই ৪৫ বছরের উপরের নাগরিকদের ডায়াবেটিস রোগের অস্তিত্ব বিচার করার নিদান দেয়। ব্রিটেনের সরকারি স্বীকৃত সংস্থা 'নাইস' (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) যাদের মতামতের উপরে ভিত্তি করে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি সম্পদ খরচ করা হয়, ডায়াবেটিসের রোগ সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য ৪০ বৎসরের অধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'নিজে বিচার কর" (self assessment system) ধরনের প্রশ্নমালা প্রবর্তন করে ২০১২ সালে।[১৭] এই মূল্যায়নে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা উদয় হলে প্রশাসন বিনামূল্যে খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ অথবা গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন পরীক্ষার বন্দোবস্ত করে আর এরই সঙ্গে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী কর্মশালায় অন্তর্ভুক্ত করে।

মোদ্দা কথাগুলো আর একবার

১.যে সব মানুষ উচ্চরক্তচাপে আক্রান্ত বা রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অথবা যদি বয়স চল্লিশ থেকে সত্তর বৎসরের মধ্যে এবং দেহভর *২৫ (আমাদের দেশে ২৩)-এর বেশি তাদের পরীক্ষাগারের প্রথাগত খালি পেটের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ধারণ প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই প্রয়োজনে ডিজিটাল 'গ্লুকোমিটার' দিয়ে আঙুলের এক ফোঁটা রক্তের 'স্ট্রিপ টেস্ট' স্বীকৃত নয়। এর সাথে 'গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন' পরীক্ষা একটি অতিরিক্ত স্বীকৃত রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা, বিশেষ করে যখন খালি পেটে রক্ত পরীক্ষা করার অসুবিধা থাকে। এই দুই ধরনের পরীক্ষার যেকোনো একটি করলেই চলবে। পরীক্ষায় অস্বাভাবিক ফল পাওয়া গেলে দ্বিতীয়বার ঐ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।

২.আট ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পরে রক্তের নমুনার গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে যদি সেটা প্রতি ডেসিলিটারে ১২৬ মিলিগ্রাম বা তার বেশি (≥126 mg/dL , 7.0 mmol/L) পাওয়া যায় অথবা যেকোনো সময় রক্তের গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৬.৫ % বা তার বেশি হয় (≥6.5 percent) তবে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে এই অস্বাভাবিক ফলটা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.উপরের ঐ দুইটি পরীক্ষার ফল উপরে বর্ণিত মাত্রার কম কিন্তু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ১০০ মিলিগ্রামের বেশি ও গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৫.৭ % এর বেশি (<100 mg/dL (5.6 mmol/L) or A1C <5.7) পাওয়া গেলে তাদের পূর্ণ-ডায়াবেটিসের (overt diabetes) পূর্বাবস্থা (প্রি-ডায়াবেটিস) আছে গণ্য করা হবে। এই সময় থেকেই প্রকাশিত ডায়াবেটিসের অনুষঙ্গ হৃদ্‌রোগের সূত্রপাত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী (ধূমপান বন্ধ করা, নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম করা ও সুষম খাদ্য নির্বাচন) অনুসরণ না করলে সমূহ বিপদ। এই অবস্থায় প্রতি দুই বৎসর অন্তর উপরে বিবৃত ডায়াবেটিসের রোগ নির্ণয়কারী পরীক্ষাগুলো করে যেতে হবে।

৪.যে সমস্ত ব্যক্তির ডায়াবেটিসের রোগলক্ষণ থাকে তাদের ক্ষেত্রে

ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বেশি এমন বাছাই করা মানুষের শ্রেণির আট ঘণ্টা খালি পেটে থাকার পরে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করা কাজের।

খালি পেটে রক্ত পরীক্ষা কষ্টকর হলে 'র‍্যা ন্ডম' বা যে কোনো সময়ের রক্ত পরীক্ষার চল আছে। এটাও স্বীকৃত।

৫.খালি পেটের রক্ত ও 'গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিনের পরীক্ষায় ভিন্ন ধরনের (একটা স্বাভাবিক ও অন্যটা অস্বাভাবিক) ফল পাওয়া গেলে অস্বাভাবিক ফলটি দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে এবং সেটাই শ্রেণিবিভাগের (ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিসের পূর্বাবস্থা, বা সুস্থ) ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হবে।

৬.এই সব ধরনের পরীক্ষায় স্বাভাবিক ফল পাওয়া গেলে প্রতি তিন বছর অন্তর এই পরীক্ষা / পরীক্ষামালা করে যেতে হবে। যাদের ফল স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বসীমায় বা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের মাঝামাঝি

(প্রি-ডায়াবেটিস) তাদের ক্ষেত্রে প্রতি দুই বছর অন্তর এই পরীক্ষামালা করার নিদান দিচ্ছে নিয়ামক সংস্থা (আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন)।

* দেহভর একটি স্থূলত্বের মাত্রা প্রকাশের গাণিতিক উপায়। শরীরের উচ্চতা মিটারে প্রকাশ করে তার বর্গ দিয়ে কিলোগ্রামে প্রকাশ করা শরীরের ওজনকে ভাগ করে এটি পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগন হিসেব কষে দেখেছেন, সাদা চামড়ার মানুষের ক্ষেত্রে এটির স্বাভাবিক উর্ধ্বসীমা ২৫, আমাদের ক্ষেত্রে এটি ২৩।

বিনা পয়সায় হলেও বিনা কারণে রক্ত পরীক্ষা করলে ক্ষতিও হতে পারে এই আমার শেষ কথা। এই গ্লুকোমিটারের স্ট্রিপ দিয়ে আঙুলের এক ফোঁটা রক্তের পরীক্ষা, যেটা কিনা ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের জন্য আদৌ স্বীকৃত নয়, সেটায় ডায়াবেটিস রোগ থাকলেও প্রায় অর্ধেক মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ফল দেবে (৫০% সেন্সিটিভিটি)। এই ব্যাপারটাই তার বড়ো ক্ষতি করবে। তখন সে ভাবতেই পারে সে অতিমানব বা ঐ ধরনের কিছু, আপামর জনগণের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার দায় তার নেই। তার প্রিয় প্যাকেট প্যাকেট পটাটো চিপস আর বোতল বোতল মিষ্টি ঠান্ডা পানীয় খেতে খেতে সোফায় বসে সে কেবলই ক্রিকেট খেলা দেখবে তার বিনোদনের সময়টিতে। নিজে কিছুতেই মাঠে ঘাম ঝরাতে যাবে না।

তথ্যসূত্র:

১. Cowie CC, Rust KF, Ford ES, et al. Full accounting of diabetes and pre-diabetes in the U.S. population in 1988-1994 and 2005-2006. Diabetes Care 2009; 32:287.

২. American Diabetes Association. 2. Classification and Diagnosis of Diabetes. Diabetes Care 2017; 40:S11.

৩. Yang W, Lu J, Weng J, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China. N Engl J Med 2010; 362:1090.

৪. http://www.worlddiabetesfoundation.org/composite-35.htm (Accessed on June 19, 2012).

৫. Mokdad AH, Ford ES, Bowman BA, et al. Prevalence of obesity, diabetes, and obesity-related health risk factors, 2001. JAMA 2003; 289:76.

৬. Tunceli K, Bradley CJ, Nerenz D, et al. The impact of diabetes on employment and work productivity. Diabetes Care 2005; 28:2662.

৭. Blunt BA, Barrett-Connor E, Wingard DL. Evaluation of fasting plasma glucose as screening test for NIDDM in older adults. Rancho Bernardo Study. Diabetes Care 1991; 14:989.

৮. Kramer CK, Araneta MR, Barrett-Connor E. A1C and diabetes diagnosis: The Rancho Bernardo Study. Diabetes Care 2010; 33:101.

৯. Herman WH, Smith PJ, Thompson TJ, et al. A new and simple questionnaire to identify people at increased risk for undiagnosed diabetes. Diabetes Care 1995; 18:382.

১০. Lindström J, Tuomilehto J. The diabetes risk score: a practical tool to predict type 2 diabetes risk. Diabetes Care 2003; 26:725.

১১. Glümer C, Carstensen B, Sandbaek A, et al. A Danish diabetes risk score for targeted screening: the Inter99 study. Diabetes Care 2004; 27:727.

১২. Heikes KE, Eddy DM, Arondekar B, Schlessinger L. Diabetes Risk Calculator: a simple tool for detecting undiagnosed diabetes and pre-diabetes. Diabetes Care 2008; 31:1040.

১৩. Bang H, Edwards AM, Bomback AS, et al. Development and validation of a patient self-assessment score for diabetes risk. Ann Intern Med 2009; 151:775.

১৪. Buijsse B, Simmons RK, Griffin SJ, Schulze MB. Risk assessment tools for identifying individuals at risk of developing type 2 diabetes. Epidemiol Rev 2011; 33:46.

১৫. Selph S, Dana T, Blazina I, et al. Screening for type 2 diabetes mellitus: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2015; 162:765.

১৬. Simmons RK, Echouffo-Tcheugui JB, Sharp SJ, et al. Screening for type 2 diabetes and population mortality over 10 years (ADDITION-Cambridge): a cluster-randomised controlled trial. Lancet 2012; 380:1741.

১৭. PH38 Preventing type 2 diabetes - risk identification and interventions for individuals at high risk: guidance. http://guidance.nice.org.uk/PH38/Guidance/pdf/English. স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. গৌতম মিস্ত্রি, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, হৃদ্‌রোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

উচ্চরক্তচাপের জটিলতা এড়াতে হলে

উচ্চরক্তচাপ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়-র পাতায়। আলোচনার শেষ নেই—এতটাই গুরুত্বপূর্ণ অসুখটা। আজকের আলোচনা উচ্চরক্তচাপের জটিলতা নিয়ে—লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

ছোঁয়াচে নয় এমন অসুখগুলোর মধ্যে অন্যতম উচ্চরক্তচাপ, যাতে সারা পৃথিবীতে অনেক মানুষ আক্রান্ত। এই রোগে ধমনীর দেওয়ালে দীর্ঘদিন ধরে রক্তের চাপ এতটা বেশি থাকে যে তা থেকে শরীরের নানা ক্ষতি হতে পারে।

আমাদের হার্ট কতটা রক্ত পাম্প করছে আর সেই রক্ত ধমনী দিয়ে যাওয়ার সময় কতটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তা দিয়ে নির্ধারিত হয় ধমনীর রক্তচাপ। হার্ট একেক বারে যত বেশি রক্ত পাম্প করবে আর ধমনী যত সংকীর্ণ হবে রক্তচাপ তত বেশি হবে।

সমস্যাটা হল—কার উচ্চরক্তচাপ আছে এটা বোঝার। বছরের পর বছর রক্তচাপ বেশি, অথচ রোগীর কোনো কষ্ট নেই—এমনটাই বেশি হয়। তার মানে কিন্তু এমনটা নয় যে, বেশি রক্তচাপের জন্য রক্তনালী বা হার্টের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। রোগীর অজান্তেই ক্ষতি হয়ে যেতে থাকে, অনেক সময় রোগ ধরা পড়ে, হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মতো কোনও বড় বিপদ ঘটলে।

তবে ভালো ব্যাপার হল—উচ্চরক্তচাপ নির্ণয় করা সহজ, রক্তচাপ মাপলেই হল। আর উচ্চরক্তচাপ ধরা পড়লে ডাক্তারের সহায়তায় রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনা খুব কঠিন নয়।

তাই ডাক্তারকে দেখাতে গেলে রক্তচাপ দেখিয়ে নেওয়া ভালো।

➢ ১৮ বছর বয়স থেকে দু-বছর ছাড়া রক্তচাপ মেপে দেখা উচিত।

➢ ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সে প্রতি বছরে রক্তচাপ মাপা উচিত।

➢ বয়স ১৮ থেকে ৩৯, কিন্তু উচ্চরক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি যাঁদের তাঁদের অবশ্য প্রতি বছরেই রক্তচাপ মাপা উচিত।

উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি কাদের বেশি?

- বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকি বাড়ে। পুরুষদের মাঝবয়সের শুরুতে, মোটামুটি ৪৫ বছর বয়স থেকে ঝুঁকি বেশি। মহিলাদের ঝুঁকি বেশি ৬৫ বছর বয়সের পর থেকে।
- যাঁদের পূর্ব পুরুষদের উচ্চরক্তচাপ আছে/ ছিল, তাঁদের উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি বেশি।
- স্থূল বা ওজন বেশি।
- শারীরিক পরিশ্রম যাঁরা কম করেন।
- ধূমপায়ী বা মুখে খাওয়া তামাকের নেশা যাঁদের আছে।
- নুন যাঁরা বেশি খান।
- যাঁদের খাবারে পটাশিয়াম কম থাকে।
- যাঁদের খাবারে ভিটামিন ডি কম থাকে।
- যাঁরা বেশি মদ খান।
- যাঁদের মানসিক চাপ বেশি।
- কিডনির রোগ, ডায়াবেটিস মেলিটাস ও স্লিপ অ্যাপ্নিয়া যাঁদের আছে।

—তাঁদেরও উচ্চরক্তচাপের ঝুঁকি বেশি।

আসুন দেখি অনিয়ন্ত্রিত উচ্চরক্তচাপে কী কী হতে পারে?

☞ **অ্যানিউরিজম:** উচ্চরক্তচাপের কারণে কোনো ধমনীর দেওয়ালে ফুলে ওঠে। একে বলে ধমনীর অ্যানিউরিজম। সাধারণত অ্যানিউরিজম আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ ছাড়াই। এর উপস্থিতি বোঝা যায় যখন তা ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণে জীবন-সংশয় করে, বা যখন তা বেড়ে পাশের কোনো প্রত্যঙ্গের চাপ দেয় বা কোনো রক্তনালীর রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দেয়।

☞ **কিডনির ক্রনিক (অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী) রোগ:** কিডনির রক্তনালীগুলো সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া কিডনি কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে।

☞ **চোখের ক্ষতি:** চোখের রক্তনালী ফেটে বা তা থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে দৃষ্টিশক্তি কমে, অন্ধত্বও হতে পারে।

☞ **হার্ট অ্যাটাক:** হার্টের মাংসপেশির একাংশে রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই অংশ অক্সিজেন পায় না, তার কোষ-কলার মৃত্যু ঘটে। বুকে ব্যথা বা চাপ ভাব, শরীরের ওপরের অংশে অস্বস্তি,

শ্বাসকষ্ট—এই উপসর্গগুলো থাকলে হার্ট অ্যাটাক সন্দেহ করতে হবে।

☞ **হার্ট ফেলইয়োর বা হার্টের বিকলতা:** এই অবস্থায় হার্ট শরীরের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট রক্ত পাম্প করতে পারে না। শ্বাসকষ্ট হয়, দুর্বল লাগে, গোড়ালি-পা-পেট ফুলে যায়, গলার শিরা ফুলে থাকে।

☞ **প্রান্তীয় ধমনীর রোগ:** এই রোগে পায়ের ধমনীগুলোতে চড়া পড়ে, ফলে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। হাঁটলে বা সিঁড়ি চড়লে পায়ের পাতা, পা, পাছায় ব্যথা, খিঁচ, অবশ ভাব, ভারী ভাব হয়।

☞ **স্ট্রোক:** মস্তিষ্কের ধমনী অবরুদ্ধ হয় বা ফেটে যায়। হঠাৎ করে হওয়া কমজোরি, মুখ-হাত-পায়ে পক্ষাঘাত বা অসাড় ভাব, কথা বলতে অসুবিধা, দেখতে অসুবিধা—এই সব হল স্ট্রোকের উপসর্গ।

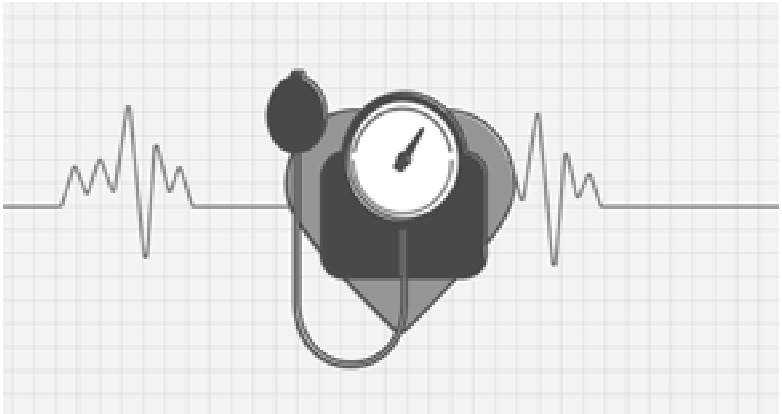

☞ এছাড়া স্মৃতিশক্তি খোয়ানো, কথা বলার সময় শব্দ খুঁজে না পাওয়া, কথাবার্তার সময় খেই হারানো—এই সবও উচ্চরক্তচাপের জটিলতা হতে পারে।

মনে রাখবেন—এই জটিলতাগুলো কিন্তু স্থায়ী, বেশির ভাগেরই তেমন চিকিৎসা নেই। তাই উচ্চরক্তচাপ আছে কিনা নিশ্চিত হওয়া, উচ্চরক্তচাপ পাওয়া গেলে তার চিকিৎসা করা—এটাই বাঞ্ছনীয়। আর মনে রাখবেন উচ্চরক্তচাপ এমন একটা রোগ যা সারানো যায় না, রক্তচাপ কেবল নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তাই ভালো আছি বা রক্তচাপ কম আছে ভেবে ওষুধ বন্ধ করা বোকামির কাজ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের অনেকগুলো ক্লিনিকে চিকিৎসক হিসেবে যুক্ত।

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

Advt.

অনীক

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

গোরুর Raw(র)চোনা

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটোবেলায় আমাদের সকলকেই গোরুর রচনা পড়তে হত। 'সেই ছেলেটার' একটাই গোঁ—সে অন্য কোনো রচনা আর পড়বে না। পরীক্ষায় যে রচনাই আসুক না কেন, সে সেটাকে গোরুতে নিয়ে ফেলবেই, আর তারপর তরতর করে গোরুর রচনা লিখে দেবে। তার অদ্ভুত মুনশিয়ানার একটা নজির—একবার পরীক্ষায় এল 'একটি শ্মশানের কাহিনি'। 'সেই ছেলেটি' দু-এক লাইনে শবটাকে শ্মশানঘাটে এনে ফেলেই দেখতে পেল হাড়গোড়—ওর কথায় গোরুর হাড়গোড়। ব্যস! ওকে আর পায় কে! হাড়গোড় থেকে নামিয়ে দিল পুরো গোরুর রচনা। বোধ করি, সকলের ক্লাসেই একটা-আধটা 'সেই ছেলেটা' থাকত। সেজন্যে এটা সকলেরই জানা কথা।

কিন্তু সে তো ছিল ছোটোবেলার কথা। ছোটোবেলায় ওরকম একটু-আধটু সকলেই করে থাকে। কিন্তু আজ যখন 'ধেড়ে খোকারা' গোরুর র-চোনা নিয়ে এমন দাপাদাপি মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে যে আম-পঞ্চজনার ত্রাহি ত্রাহি দশা তখন সেটাকে কী বলা যায়! গোরক্ষাবাহিনীর এমন মত্তহস্তী-চলনে গোরুগুলোও যে ঘাবড়ে গিয়ে একটু বেশি বেশি খাঁটি চোনা ছাড়বে, তা আর এমন বেশি কথা কী! আর সে চোনা সুদৃশ্য মোড়কে বোতলবন্দি হয়ে দুধের থেকে অন্তত দশ গুণ বেশি দামে বিকোবে, তাও তো নয়া জমানারই ফরমান। চোনার এমনই মাহাত্ম্য যে রক্তাম্বর-পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত সাধুবাবাটি গোরুর পুচ্ছটি তুলে আঁজলা ভরে পবিত্র চোনাপানে নিজেকে ধন্য করছেন আর সে ছবি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। ওরা যদি এতেই ক্ষান্তি দিত তাহলে হয়তো আমজনতার এতটা ভোগান্তি হত না।

কিন্তু না। পবিত্র 'গোমাতা' রক্ষায় গোরক্ষাবাহিনী গুঁতিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে কত নিরীহ মানুষের যে জান নিয়ে নিল, তার খতিয়ান কে রাখে! গোরুর দিকে তাদের এতটাই তীক্ষ্ণ নজর যে নেহাতই মানবশিশুরা তাদের নজরেই পড়ে না। ফলে গোরখপুরে সরকারি বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাবে এক দিনে তিরিশটি শিশু মারা যায়। তার পর পর ক-দিনও শিশুমৃত্যু ঘটতে থাকে। গোরখপুর উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগীর খাসতালুক। তাঁর আঙুল না নড়লে সেখানে গাছের একটা পাতাও খসে না। এই ঘটনার পর তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল: এরকম ঘটনা আগেও অনেক ঘটেছে। যেন আগে ঘটেছে বলেই এমন পাইকারি হারে শিশুমৃত্যু একটা স্বাভাবিকতার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। আদিত্যনাথ যে-সে লোক নন। সঙ্ঘ-পরিবারের নানা কিসিমের বিভিন্ন বাহিনীর বাইরেও তাঁর নিজস্ব একটি বাহিনী আছে—হিন্দু যুবা বাহিনী। তারাই আদিত্যনাথের নামে গোরখপুরে যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালায়। সঙ্ঘ-পরিবারের মধ্যে থেকেও আদিত্যনাথের এই স্বতন্ত্র চলন সঙ্ঘ তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর না-পসন্দ। কেননা, গুজরাতে বহু কাণ্ডের নায়ক থেকে মোদীর ভারতবর্ষের 'বিকাশ পুরুষ' রূপে উত্থান। তাঁর মনে শঙ্কা জাগতেই পারে—লখনউ থেকে কখন-না যোগী 'জয় বজরঙবলী' বলে দিল্লির মসনদে এসে লাফিয়ে পড়েন। সুতরাং শিশুমৃত্যু নিয়ে চলতে থাকে চাপান-উতোর। সুরাহা কিছু হয় না। অন্য দিকে চলতেই থাকে গোরু বাঁচানোর নামে মানুষ মারা। তাদের হাড়গোড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে দেশের সর্বত্র। 'ধেড়ে খোকাদের' এই কাণ্ডকারখানা দেখে সেই ছেলেটা ভাবতে বসে: বাব্বা! যত কাণ্ড গো-রক্ষা-পুরে!

গোমাতা রক্ষা আর শিশুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা—আরও ভালো বোঝা যাবে ফিলহালের কিছু খবরের ওপর চোখ বোলালে। পড়ুয়াদের সুবিধের জন্যে সেরকম কিছু খবর এখানে তুলে দেওয়া গেল।

প্রথমে দেখি গোরুর দিকে তাকাতে গিয়ে মানুষের কী দশা হচ্ছে। ফ্রিজে নাকি গোরুর মাংস ছিল, এই অভিযোগেই প্রায় দু-বছর আগে দিল্লি থেকে ৩৫ মাইল দূরে দাদরিতে মহম্মদ আখলাককে পিটিয়ে মারা হয়েছিল। সেই ট্র্যাডিশন কি থেমেছে? দেখা যাক!

হেডলাইন ১. "উনা-র ঘটনার পুনরাবৃত্তি: গুজরাতে দলিত মা ও ছেলে প্রহৃত।"

মাত্র এক বছর আগে গুজরাতের উনা-য় চারজন দলিত যুবক যখন একটা মরা গোরুর ছাল ছাড়াচ্ছিল তখন তাদেরকে নগ্ন করে নৃশংসভাবে চাবকানো হয়। একইরকমভাবে গত শনিবার রাতে আনন্দ জেলায় শৈলেশ রোহিত (২১ বছর) ও তার মা মনিবেন (৪৫) যখন

তাদের পেশার কাজ করছিল তখন কাসোর গাঁয়ের দরবার (ক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের লোকজন এসে প্রথমে তাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করে। তারপর লাঠি দিয়ে বেধড়ক পিটুনি দেয়। (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৫ আগস্ট, ২০১৭)।

হেডলাইন ২. "৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গোরখপুর হাসপাতালে আরও ৩৪ জন শিশুমৃত্যু"

জাপানি এনকেফেলাইটিস-এ অনিবার্য মৃত্যু কোনোমতেই ঠেকানো যাচ্ছে না। গত সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে বি আর ডি হাসপাতালে ৩৪ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রিন্সিপাল বলেছেন: অক্সিজেন দেরিতে এসে পৌঁছেছিল। (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৭ আগস্ট, ২০১৭)।

তবে এটা নিয়ে তত ভাবার কিছু নেই, উত্তরপ্রদেশ ও ভারতের শাসক দল বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ বলছেন। "এমন মর্মান্তিক ঘটনা এর আগেও ঘটেছে"। একটু ওনার জবানে শোনা যাক, "ইতনে বড়ে দেশ মেঁ বহুত সারে হাদসে হুয়ে। পহলি বার অ্যায়সা নাহি হুয়া। তিনি আরও বলেন: যোগীজি নে টাইম-বাউন্ড যাঁচ রাখ্খা হে। মগর ইয়ে হাডসা হে। ইয়ে গলতি হে, কিসি ভি স্তর পর। ইস সে হমারা গরিবোঁকা ডেভেলপমেন্টকা ইন্টেনশন হ্যায়, ইয়ে ডিনাই নহিঁ কর্ সকতে।" (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৫ আগস্ট, ২০১৭)

বাংলায় বললে, ভারতের মতো বিরাট দেশে এরকম অনেক ট্র্যাজেডি অতীতে ঘটেছে, এটা প্রথম নয়। মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ যোগী এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু এটা ট্র্যাজেডি, এবং কোনো স্তরে গাফিলতি হয়েছে। কিন্তু এ থেকে গরিবের উন্নতির জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে কম করে দেখা যাবে না।"

কিন্তু সত্যিই কি শিশুমৃত্যু নেহাতই একটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া ট্র্যাজেডি? এ নিয়ে সরকার আগে কিছুই জানতে-বুঝতে পারেনি? না-পারার কথা তো নয়! যাঁরা বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখেছেন, তাঁরা কী বলছেন?

হেডলাইন ৩. নীলেশ মিশ্র *টাইমস অব ইন্ডিয়া*-র ২০ আগস্ট, ২০১৭-য় তাঁর কলামে লেখেন:

> *গোরখপুরের বি আর ডি হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর কারণ অক্সিজেনের অভাব কি না, তা আর জানবার উপায় নেই কোনো। কেননা, এই খবর চাউর হয়ে যাওয়ার অনেক আগেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শেষ রাতে মৃত শিশুদের মা-বাবাকে জোর করে যে-যার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে মৃত শিশুদের সমাধিস্থ করতে বাধ্য করে।
>
> *গোরখপুরের এই মৃত শিশুদের গল্প আসলে কয়েক দশক ধরে চলা পুরোনো গল্প—গোরখপুর প্রশাসনের তথা সরকারের চরম অকর্মণ্যতার নিদর্শন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনের সবদিকেই। গোরখপুর উত্তরপ্রদেশের সবথেকে নোংরা ঘিঞ্জি এলাকা। এর একটা বড়ো অংশে নোংরা সরাবার ঢাকা নর্দমা নেই। মানুষ খোলা জায়গায় প্রাতঃকৃত্যাদি সারে। ফলে শহরের নিকাশি-সমস্যার মতোই গ্রামও নোংরা-আবর্জনায় ভরে যায়।
>
> *আপনারা কি জানেন, শহরের যত আবর্জনা জড়ো করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামে। সেখান থেকে কোথায় নেওয়া হয়? কোথ্থাও না—ফলে গ্রামে আবর্জনাস্তূপের পাহাড় জমতে থাকে। গাঁয়ে-গাঁয়ে এসে গেছে কুড়কুড়ের প্যাকেট আর পানীয় জলের বোতল—ব্যবহারের পর সেগুলো পড়ে থাকে যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে; পচে না, কোনোভাবেই নষ্ট হয় না। ফলে শহর থেকে গাঁয়ে পরিবেশ-দূষণ সংক্রামিত হচ্ছে দ্রুত। আর সরকার মনে করে, গাঁয়ের মানুষ বুঝি কয়েক দশক আগের মতোই সহজ-সরল জীবন যাপন করে চলেছে।
>
> *আর একটা কথা, আমার খুব জরুরি মনে হয়—সরকারি বরাদ্দ কীভাবে খরচা হয় তা দেখার কেউ নেই। যিনি খরচা করেন, তিনিই কীভাবে খরচা হল তার তত্ত্বাবধান করেন।
>
> *এখন বুক চাপড়ালে কী হবে। এই বি আর ডি হাসপাতালেই বছরে প্রায় দু-হাজার শিশুর মৃত্যু হয়। গত দশ বছরে এখানে অন্তত দশ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সরকার জনস্বাস্থ্য থেকে পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নিয়েছে। ভাবখানা এইরকম—যা করবার বেসরকারি উদ্যোগগুলো করুক। এর অনিবার্য ফল—গোরখপুরের ঘটনা!
>
> *এনকেফেলাইটিস-এ যখন বছর-বছর হাজার-হাজার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে তখন গ্রামগুলোতে কেন পয়পরিষ্কার করার জন্যে সাফাই অভিযান চলে না? গাঁয়ের মানুষকে এই মারণরোগ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয় না?
>
> *উত্তরপ্রদেশের বেশিরভাগ হাসপাতালই যখন উৎপাদকের থেকে সরাসরি তরল অক্সিজেন কেনে তখন বি আর ডি কেন বছর-বছর পুষ্পা সেলসকে ঠিকেদারির বরাদ দেয়? প্রিন্সিপাল রাজীব মিশ্রর চেয়ারে কীভাবে তাঁর স্ত্রী এসে বসতে পারেন? ডা. কাফিল খান কী করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস চালান?—তার বিজ্ঞাপন আবার হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটা থাকে! অক্সিজেন যে ফুরিয়ে আসছে—বার বার বলা সত্ত্বেও সে কথায় কান দেওয়া হয়নি কেন? প্রিন্সিপালের তহবিলে টাকা সত্ত্বেও ঠিকেদারের টাকা মেটানো হয়নি কেন? এরকম খুঁজতে থাকলে 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে' বেরিয়ে পড়বে।

হেডলাইন ৪. "যোগী সরকার মেডিক্যাল শিক্ষাখাতে বাজেট-বরাদ্দ ৫০ শতাংশ ছাঁটাই করে দিয়েছে।" *টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৭ আগস্ট, ২০১৭

বিজ্ঞানভিত্তিক মেডিকেল শিক্ষা হলে তবেই না স্বাস্থ্য নিয়ে এই বেহাল দশা নিয়ে কারণ খুঁজবেন ডাক্তাররা, আর মানুষ তা জানতে পারবেন? সেদিকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তীক্ষ্ণ নজর!

স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ কমছে, আর তাই নিয়ে তেমন প্রতিবাদ

হচ্ছে না, কারণ মানুষ বেশি ব্যস্ত গোরক্ষা নিয়ে, গোরুর মাংস কে খেল বা কেন খেল তাই নিয়ে। স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো আসল জিনিসগুলো আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনার মধ্যেই ঢুকতে পাচ্ছে না। কিন্তু গোমাতা-রা ভাল আছেন তো?

কেমন আছে গোরু?

হেডলাইন ১. "গোশালায় ৫০ টি গোরুর মৃত্যুর জন্যে বিজেপি নেতা গ্রেফতার"

বিজেপি নেতা হরিশ ভার্মা জামুল নগর পালিকা-র ভাইস চেয়ারম্যান। গৌ সেবা আয়োগ-সচিব ডা. এস কে পানিগ্রাহীর অভিযোগের ফলে হরিশ ভার্মা তাঁর মালিকানাধীন গোশালায় ৫০টি গোরুর অনাহারে মৃত্যুর জন্যে গ্রেফতার হন। তাঁকে আয়োগ গোরুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ৯৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। পানিগ্রাহী টি ও আই-কে বলেন: গোরুগুলো মারা গিয়েছে না খেতে পেয়ে আর অঝোর বৃষ্টিতে ভিজে। (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ১৯ আগস্ট, ২০১৭)

হেডলাইন ২. "বিজেপি নেতার গোশালায় কেন গোরুগুলো মারা গেছে না খেতে পেয়ে?"

এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি।

দুর্গ গোশালায় বহু গোরুর একই সময়ে মৃত্যুর ঘটনাটি একটি নতুন মোড় নিয়েছে। গোশালাটির মালিক বিজেপি নেতা হরিশ ভার্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তিনি তার পুকুরের মাছকে খাওয়ানোর জন্যে মরা-গোরুর ছাল ছাড়িয়ে নিতেন। গোরুপাচার-চক্রের সঙ্গেও তিনি জড়িত। সরকারি তরফে এসম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করলেও এক উচ্চপদস্থ আমলা জানিয়েছেন: অভিযোগের তদন্ত চলছে। কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী ব্রিজমোহন আগরওয়াল গত শনিবারে কাজে অবহেলার জন্যে ন-জন অফিসারকে সাসপেন্ড করেছেন ও গৌ সেবা আয়োগ-এর সেক্রেটারিকে শো কজ করেছেন। (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ২০ আগস্ট, ২০১৭)

হেডলাইন ৩. "তহবিলের অভাবে গোশালা-মালিকরা অনশনে বসেছে।"

গোরুপাচারকারীদের থেকে যে ২০১ টি গোরু উদ্ধার করা হয়েছে তাদের জন্যে খাবার নেই, ওষুধ নেই। সে কারণে যোগী শ্যামনাথ, যিনি একটি গোশালা চালান, তহবিল চেয়ে আদিত্যনাথকে চিঠি লেখেন ও বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে অনশনে বসেন। (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ২০ আগস্ট, ২০১৭)।

গোরক্ষার যে নমুনা ওপরের খবর থেকে পাওয়া গেল, তা থেকে মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্রর 'মহেশ' গল্পের জমিদার আর টিকিধারি বামুনগুলোর কথা। মেকি গো-দরদি এই মানুষগুলো খিদের মুখে মহেশকে এক আঁটি খড়ও দিতে চায়নি। মহেশ-এর ট্র্যাডিশন আজও অব্যাহত।

কে ভাল আছে তবে?

গোমাতা-গণও তেমন ভাল নেই দেখা যাচ্ছে, এমনকী এই গোভক্ত-চালিত ভারতেও। তাহলে কেন গোরু পুজোর ধুম লেগেছে চারদিকে? কেন গোরখপুর, দাদরি, উনা, আনন্দ, এইসব জায়গায় মানুষের মৃত্যুমিছিল, আর 'গোভক্ত'দের গোশালায় গোরুর অসহায় মৃত্যু?

গোহত্যা নিবারণ আর তথাকথিত গোরক্ষা এদেশে নতুন কিছু নয়। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'ছোটো ও বড়ো' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাকে এক জায়গায় তিনি বলছেন:

> এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেইখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেইখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয়, এমন আর-কিছুই না। এই 'ডগমা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন-করা লইয়া য়ুরোপের ইতিহাস কতবার রক্তে লাল হইয়াছে। অহিংসাকে যদি ধর্ম বলো, তবে সেটাকে কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য বলিয়া ব্যবহারে না মানিতে পারি, কিন্তু বিশুদ্ধ আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তাহাকে স্বীকার করিয়া ক্রমে সে দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। . . . ('ছোটো ও বড়ো', *কালান্তর, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৫৫৬)।

আজও সব মিলিয়ে মনে হয়, গোরু নিয়ে হিন্দু জনমানসে যে আবেগ আছে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে, মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার একটা চেষ্টা চলছে।

দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে চেষ্টাতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও শামিল করা হচ্ছে। 'পঞ্চগব্য' নিয়ে 'বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা'। পঞ্চগব্য কী জানেন তো?—গোচোনা, গোবর, দুধ, দই, ঘি। এদেশের উচ্চস্তরের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলোর ডিরেক্টরদের বলা হচ্ছে: আপনাদের গবেষকদের বলুন, পঞ্চগব্য নিয়ে গবেষণা করতে। টাকার জন্যে ভাবনা

নেই। দেশের মানুষের টাকা সরকারের হাতে। সরকার এই গবেষণার ক্ষেত্রে দরাজ দিল, দেদার টাকা ঢালতে রাজি। তারপর আছে, 'সনাতন পদ্ধতিতে' মুন্ডু সংস্থাপন! হলে মন্দ হত না! শুধু যেসব নিহত দলিত ও 'বিধর্মী'-দের মুন্ডুহীন ধড়গুলো ছটফট করছে সেগুলোকে ধরে ধরে কোনোটায় হাতির মাথা, কোনোটায়-বা ছাগলের মুন্ডু জুড়ে দিলেই হল—অচ্ছুত, বিধর্মী মানুষ থেকে সরাসরি 'হিন্দু দেবতায়' উত্তরণ!

ভারতের মানুষের স্বাস্থ্য ও গোরুর প্রসঙ্গ

দেহভর সূচক (body mass index) যদি ১৮.৫-এর কম হয় তাহলে তা অনাহার-অপুষ্টির লক্ষণ বলে মনে করা হয়। যে দেশে/এলাকায় ৪০ শতাংশের বেশি মানুষের দেহভর সূচক ১৮.৫-এর কম সেই দেশ/এলাকাকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী দুর্ভিক্ষপীড়িত মনে করা হয়। এদেশের ৩৩-৩৫ শতাংশ মানুষের দেহভর সূচক ১৮.৫-এর কম। ৪০ শতাংশ আর ৩৫ শতাংশের মধ্যে তফাত খুবই কম। সুতরাং বলাই যায়, আমাদের দেশের এক বিশাল সংখ্যক মানুষ চলমান দুর্ভিক্ষের মধ্যে রয়েছে। (ডা. বিনায়ক সেন, 'অনাহার প্রসঙ্গে'— *সবার জন্য স্বাস্থ্য*, গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা, পৃ. ৪-৫)।

> 'কোনো স্কুল নয়, জন্মের প্রথম তিন বছর একটা শিশুর স্বাস্থ্যের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে কোনও দেশ বা জাতি কোথায় যাবে।'

'কোনো স্কুল নয়, জন্মের প্রথম তিন বছর একটা শিশুর স্বাস্থ্যের বিকাশের উপরেই নির্ভর করে কোনও দেশ বা জাতি কোথায় যাবে।' (ডা. অরুণ সিং, 'সর্বজনীন স্বাস্থ্যপরিষেবার দাবির সাথে আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেও আমাদের সোচ্চার হতে হবে', 'সবার জন্য স্বাস্থ্য', গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা, পৃ. ১০)। অথচ আমাদের দেশে শিশুস্বাস্থ্য চূড়ান্তভাবে অবহেলিত। জি এম-বীজ আর ব্যাঙ্কঋণের চক্করে পড়ে কৃষকরা ফি-বছর প্রায় গণ-আত্মহত্যা করছে। প্রধানমন্ত্রীর বহু ঢক্কানিনাদিত ঘোষণা 'সকলের জন্যে কাজ' ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেছে। দেশের আনাচে-কানাচে শোষিত মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষ নানারূপে ফেটে পড়ছে। এসব ঠেকাতে মানুষের ওপর প্রশাসনিক নিপীড়ন-নির্যাতন তো চলছেই, কিন্তু তাতে করেও সামাল দেওয়া যাচ্ছে না।

যে দেশে বেশিরভাগ মানুষ খেতেই পান না সেখানে গোরুকে রক্ষা করার জন্যে এমন লোক-দেখানো আকুলতা কেন? ভারতবর্ষে ১০ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৬০ শতাংশ সম্পদ। আমাদের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো ওই ১০ শতাংশ মানুষকেই আরও কত বেশি বেশি সুবিধে পাইয়ে দেওয়া যায়, তার জন্যে নানা ব্যবস্থা নিয়ে চলেছে। এতটা প্রকট ধনবৈষম্য খুব কম দেশেই আছে। ধনবৈষম্য থাকলে যা হয় স্বাভাবিকভাবেই দেশের স্বাস্থ্য আর শিক্ষার মানের হাল খুব খারাপ। মানুষের এতসব ভয়ানক সমস্যা থাকতেও সরকার কেন গোরুকে নিয়ে পড়েছে? এটা কি গোরুর ল্যাজ ধরে ধর্মভীরু গরিব মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে ভোট বৈতরণী পারের চেষ্টা?

পর্দার পেছনে

এসবের হোতা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস) কিন্তু কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চায়। এদের তথাকথিত 'হিন্দুত্বের' ধারণার মধ্যে ধর্মের ছিটেফোঁটা থাকলেও মূলত আছে সামাজিক আচরণবিধি। যার মোদ্দা কথা হল—এদেশে থাকতে হলে হিন্দু হয়ে থাকতে হবে। জাতপাত মেনে চলতে হবে। বিদেশিদের এদেশে স্থান হবে না। হিন্দুত্বর এই জিগির দিয়ে তারা ভারতকে একটি 'হিন্দুরাষ্ট্র' হিসেবে কল্পনা করে। আরএসএস ও তার বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলো (যার মধ্যে বিজেপি আজ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন) কখনো 'রামমন্দির স্থাপন', কখনো-বা গোরক্ষার ধুয়ো তুলে আসলে যেটা করতে চায়, তা হল সমাজে ব্রাহ্মণশাহীর মৌরসিপাট্টা কায়েম করা। কেননা, শোষিত শ্রেণিগুলোকে বিভাজিত করে রাখতে এর থেকে ভালো দাওয়াই আর হতে পারে না। এদেশের এই ব্রাহ্মণশাহী সমাজকাঠামো, (যার মূল বৈশিষ্ট্য জাতপাত দিয়ে মানুষে-মানুষে বিভেদ টানা) যেভাবে বারবার শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দিয়েছে, এমনটি পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। এ-প্রসঙ্গে বহু আগেই কার্ল মার্কস-এর পর্যবেক্ষণ ছিল: "ভারতের বিকাশ ও ক্ষমতায়নের পথে সবথেকে বড়ো ও নির্ধারক বাধা হল ভারতের জাতপাত ব্যবস্থা।" (কার্ল মার্কস, 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল', 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন'-এ প্রথম প্রকাশিত, ২৫ জুন, ১৮৫৩)। মার্কস এদেশীয় সমাজের সেকেলে জাতপাতভিত্তিক সমাজকাঠামোর সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ককে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে অন্বিত করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: 'আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্মশাসনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে এরকম অসন্তোষ ও বিপ্লবচেষ্টার গোড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে জাতিগত কর্মধারাগুলির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে কি না ভেবে দেখবার বিষয়।' ('শূদ্রধর্ম', 'কালান্তর', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৬১২)।

মার্কস-এর পর্যবেক্ষণের দেড়শো বছর পরেও এদেশে ব্রাহ্মণশাহী সমাজ কাঠামোর এতটাই দাপট যে দলিতরা যে পেশাতেই থাকুন না কেন, তাদের গা থেকে দলিত ছাপটা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না। এমনকী বিদেশে গিয়েও তাদের রেহাই নেই। সেসব দেশেতেও সমাজে বর্ণহিন্দু, দলিত এমন কোনো জাতপাতের রেওয়াজ নেই, অথচ সেখানেও দলিতদের পেছনে বর্ণহিন্দুরা লেগে থাকে, তাদেরকে অসম্মান-নিপীড়ন করতে ছাড়ে না। তার একটা উজ্জ্বল নজির সুজাতা গিদলার সাক্ষাৎকার:

দলিত রাষ্ট্রপতি? ও তো নেহাতই আদিখ্যেতা। দলিতদের গালে কষে থাপ্পড়। দলিতদের ওপর যখন নিরন্তর আক্রমণ শানানো হচ্ছে তখন এসবের কোনো মানেই হয় না: সুজাতা গিদলা।

সুজাতা গিদলা (২৬) আমেরিকায় থাকেন। সেখানে নিউ ইয়র্ক

সিটি সাবওয়ে-তে কনডাক্টরের কাজ করেন। তিনি বলেন: আমেরিকাতেও তাকে দলিত হওয়ার জন্যে নানারকম নির্যাতন অপমানের সামনে পড়তে হয়েছে। এদেশে ভারতীয়দের সংস্রব আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার এখনকার বন্ধুরা সকলেই বিদেশি। এখানে আমি আসার সময় আমার এক সহপাঠী, যে আমার আগে এখানে এসেছিল, কিছুদিন আমাকে তার বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল। কিন্তু বাড়ির লোকজন হাবেভাবে আমাকে বুঝিয়ে ছাড়ত যে আমাকে তারা মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। আমার বোন পেশায় ডাক্তার। দেশেও তার যতটা হেনস্থা এখানেও তাই। নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে যখন সে পড়ছে তখন একদিন ক্লাসে স্যার এসে তখনও পৌঁছোননি, একজন ভারতীয় ডাক্তারি-ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে বলল: 'আমি একজন রেড্ডি। এসো, আমরা সবাই জানাই—কার কী জাত। যখন আমার বোনের পালা এল তখন আর একজন ছাত্র তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন মজা দেখছে: দেখা যাক, এবার তুমি কী বলো; বলতে তো হবেই, কোন জাত থেকে তুমি এসেছ। বোন স্পষ্ট জানাল: আমি অচ্ছুত। ও যদি অন্য কিছু বলত, ওরা বলত, ও মিথ্যে বলছে। কিছু না বললে, বলত: কেন বলছ না, আমরা জানি। বিদেশি ছাত্ররা 'জাত কী' জানতে চাইলে ওরা বলত: ভারতীয় সমাজে কার কী রকম সামাজিক মর্যাদা তা জাত দিয়ে বোঝা যায়। বর্ণহিন্দু তামিল ছাত্ররা সব জায়গায় বলে বেড়াত, আমার বোন অচ্ছুত। আমেরিকায় অভিবাসী ভারতীয়রা তাদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্যে যেসব সংস্থা গড়ে তোলে সেগুলো আসলে এক-একটা জাতপাত- গোষ্ঠী। তানা (তেলুগু অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা) আসলে কাম্মা জাতের সংস্থা। তেমনি রেড্ডিদের আর-একটা—এ টি এ। এ এ টি বি (আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব তেলুগু ব্রাহ্মিণস) কোনো সাহিত্য-সংস্কৃতির আড়ালে লুকোয় না, খোলাখুলি জাতের কথা বলে। ডানপন্থী হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন (এইচ এ এফ) অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাশালী একটি সংস্থা। ওরা ক্যালিফোর্নিয়া এডুকেশন বোর্ডকে মামলা করবে বলে হুমকি দেয়, যদি না স্কুলের ইতিহাস পাঠ্যবইতে ভারতের জাতপাত ব্যবস্থার ইতিহাস ঢোকানো হয়। ওদের যুক্তি, না হলে তো সবাই ওদের ছেলেমেয়েদের টিটকিরি দেবে। একমাত্র দলিত মুক্তি নেটওয়ার্কই দলিতদের প্রকৃত অবস্থার কথা তুলে ধরে। (*টাইমস অব ইন্ডিয়া,* ২০ আগস্ট, ২০১৭)।

এদেশের তাত্ত্বিক মার্কসবাদী মহলে অথবা যাঁরা মার্কসবাদ অনুসারে শোষিত মানুষের মুক্তির জন্যে কাজ করেন, তাঁদের ভেতর মার্কস-এর এই ধারণাটি নিয়ে বিশেষ কোনো চর্চা হয়েছে বলে মনে হয় না।

শোষিত মানুষের ক্ষোভবিক্ষোভকে সামাল দিতে সংঘ পরিবার অদ্ভুত সব যুক্তি খাড়া করে। 'কাজ পাচ্ছ না! পাবে কী করে? সবই তো দলিতদের জন্যে সংরক্ষিত। ওরাই তো তোমাদের সব কাজকর্ম কেড়ে নিচ্ছে। আর নিচ্ছে মুসলমানরা—আগের সরকারগুলো ওদেরকে তোয়াজ করে করে মাথায় তুলে দিয়েছে। ওদের যতক্ষণ না টিট করতে পারছ ততদিন তোমাদের হাল ফেরানোর কোনো আশা নেই। তাই হাতে কাজ না থাকলে, পারলে গোরুর সেবা করো, আর যত পারো মুসলমান আর দলিত মারো। পুণ্যিও হবে, হালও ফিরবে।' (জনান্তিকে বলে রাখি, এদেশে আর্থিক দশার নিরিখে সবথেকে হতদরিদ্র মুসলমানরা আর তার পরেই দলিতরা।) মানতেই হয়, ওদের এই ধর্মের সুড়সুড়ি-দেওয়া কুযুক্তি হিন্দু জনমানসের আবেগের ওপর বেশ ভালোই প্রভাব ফেলতে পেরেছে। ফেলতে যে পেরেছে তার সবথেকে বড়ো নজির সংঘ পরিবার তথা বিজেপি এখন এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন।

ভারতের সংবিধান অনুসারে যতটুকু সামান্য নাগরিক অধিকার ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে এদেশের মানুষকে দেওয়া হয়েছে সেগুলোও আজ সংঘ পরিবার আর বর্তমান সরকার একের পর এক কেড়ে নিচ্ছে। এরকম একটা অবস্থায়, যখন মুসলমান ও দলিত নিধন নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে; জাতপাতের কারণে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় হওয়ার কারণে শোষিত শ্রেণিগুলোর মধ্যেই বিভেদ বেড়ে চলেছে তখন নিছক দর্শক হয়ে বসে থাকলে সর্বনাশ এড়ানো যাবে না। যে কাজটা আজ সবথেকে বেশি জরুরি তা হল মানুষের মনের ভেতর থেকে ধর্মীয় আবেগকে টেনে বার করে সেখানে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সঞ্চার করা। কাজটা যেমন কঠিন তেমনি লম্বা মেয়াদের। এ কাজটা নিরন্তর করে যেতেই হবে। কিন্তু আজকের এই অবস্থায় দরকার সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতবিরোধী এক ব্যাপক যুক্তমোর্চা গড়ে তোলা—যার চালিকাশক্তি হবে শোষিত মানুষের এমন এক রাজনৈতিক শক্তি যা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বর দৃষ্টিকোণে সমাজকে বিচার করে।

এই মোর্চা মানুষের মধ্যে গিয়ে কাজ করবে। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে, এক জাত আর এক জাতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করে একে অপরকে আরও ভালো করে জানতে-চিনতে-বুঝতে পারবে। সংঘ পরিবারের শোষিত মানুষের ওপর আক্রমণ কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তা মানুষের থেকেই শিখতে হবে। শিখে নিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। যেমনটি আমরা দেখেছি ফিলহাল বাদুরিয়া-বসিরহাটের ঘটনায়। সেখানে দাঙ্গা বাঁধানোর যে জঘন্য কুৎসিত চক্রান্ত করা হয়েছিল ও প্রথম দু-একদিনের ঘটনায় মনেও হয়েছিল—এবার এ-বাংলাতেও একটা বড়ো সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। কিন্তু না, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ওই এলাকার মানুষ কোনোরকম তথাকথিত রাজনৈতিক দলের মুরুব্বিয়ানা ছাড়াই এই চক্রান্তকে ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে। কী করে তাঁরা পারলেন—মানুষের থেকে এইসব শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। একথাও জানি: সংঘ পরিবার নয়, মানুষই শেষ কথা বলবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক।

গজানন, অজানন, পরশুরাম, মেডাওয়ার

আশীষ লাহিড়ী

সাসপেন্স না-বাড়িয়ে গোড়াতেই ধাঁধার ক্লুগুলো বলে দেওয়া যাক। গজানন অর্থাৎ হাতিমুখো গণেশ আর অজানন অর্থাৎ ছাগলমুখো দক্ষ পুরাণের প্রাণী; পরশুরামও পুরাণের, তবে এখানে আমরা উত্তর কলকাতার পার্শিবাগানে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ সংলগ্ন গলিতে অবতীর্ণ তাঁর মনুষ্য-অবতারের (১৮৮০-১৯৬০) কথাই বলব; আর পিটার মেডওয়ার (১৯৫১-১৯৮৭) ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, টিসু এবং অঙ্গ প্রতিস্থাপনে মৌলিক অবদানের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ১৯৬০ সালে। এরাই এ গপ্পের কুশীলব। ইদানীং প্রাচীন ভারতীয়দের (তাঁরা 'হিন্দু' কিনা আমর জানা নেই) অঙ্গ-প্রতিস্থাপন-পটুত্ব নিয়ে বাজার বেশ গরম। সেই বাজার ধারার আশায় একটি আঠেরো-বছরি টিভি সিরিয়ালের প্রকল্প মাথায় নিয়ে এই গপ্পোটি ছাড়লাম। দেখা যাক কোন ডাক পাই কিনা।

এক

গণেশ বাবাজির ঘাড়ে যে-মুন্ডুটি আমরা দেখি, সেটি তাঁর বংশগত নয়, বাইরে থেকে 'অর্জিত'। আর মেন্ডেলীয় জেনেটিক্স মতে যেহেতু

'অর্জিত' বৈশিষ্ট্য উত্তরপুরুষে আর বর্তায়নি। কীভাবে এই অর্জন ঘটল? এই মুন্ডু-প্রতিস্থাপন নিয়ে পুরাণে অনেক কাহিনি আছে। এক নম্বর গপ্পটি এইরকম: দক্ষযজ্ঞে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুন্যকব্রত অনুষ্ঠান করেন। এক বৎসর পুন্যকব্রত করার পর বিষ্ণু প্রীত হয়ে পার্বতীকে পুত্রলাভের বর দেন। যথাসময়ে বিষ্ণুর বরে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা স্বর্গ,মর্ত্য,পাতাল ইত্যাদি সকল স্থান থেকে নবজাত শিশুকে দেখবার জন্য উপস্থিত হন। অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শনিও আসেন। কিন্তু শনি এই নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত না করে মাথা হেঁট করে বসেছিলেন। পার্বতী শনিকে তাঁর পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বারংবার অনুরোধ করেন। উত্তরে শনি বলেন যে, আমি চিত্ররথের কন্যাকে বিবাহ করি। একদিন আমার স্ত্রী ঋতুস্নান করে আমার সঙ্গম প্রার্থনা করে, কিন্তু তখন আমি এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলাম যে, স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিনি। ফলে ঋতু বিফলে যাওয়ায় আমার স্ত্রী আমাকে শাপ দেন যে, আমি যার দিকে দৃষ্টিপাত করব তৎক্ষণাৎ সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সমস্ত বিবরণ শুনেও পার্বতী শনিকে তাঁর নবজাতকের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে বলেন। শনি শিশুর দিকে দৃষ্টিপাত করা মাত্র শিশুর মুন্ডু দেহচ্যুত হয়। এই সংবাদ বিষ্ণু কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসেন। পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তী দেখে সুদর্শনচক্রের সাহায্যে তাঁর মস্তক কেটে নিয়ে আসেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ পার্বতীর বেয়াক্কেলেপনার মাশুল দিতে হল বেচারি গণেশকে এবং একটি হস্তীকে।

গপ্প নম্বর দুই। একবার সূর্য মালী ও সুমালী নামে দুই শিবভক্তকে বধ করতে উদ্যত হলে শিব সূর্যকে ত্রিশূলঘাত করেন। এই আঘাতের ফলে সূর্য চেতনাহীন হন। এর ফলে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। সুর্যের পিতা মহর্ষি কশ্যপ পুত্রকে হতচেতন অবস্থায় দেখে শিবকে অভিশাপ দেন যে, শিবের পুত্রের মস্তক ছিন্ন হবে। এই অভিশাপের ফলে গণেশ নিজের মুন্ডু হারান ও ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর মস্তক তাঁর মস্তকোপরি স্থাপন করে দেওয়া হয়।

গপ্প নম্বর তিন। সিন্দুর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবেশ করে গণেশের মস্তক কর্তন করে। কিন্তু মুন্ডু কাটা পড়া সত্ত্বেও গর্ভস্থ বালকের জীবননাশ হয় না। জন্মগ্রহণ করার পর নারদ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে গণেশ এই বিবরণ জানান। তখন নারদ তাকে নিজেই নিজের মস্তক সংগ্রহ করতে বলেন। বালক তখন আপন তেজে গজাসুরের মাথা কেটে নিজের দেহে যোগ করেন। সেই হতে গণেশের নাম হয় গজানন।

গপ্প নম্বর চার। পার্বতীর দিব্য গাত্র-মল থেকে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেব পার্বতীকে প্রীত করবার জন্য একটি গজমস্তক এর মস্তকহীন দেহে সংশ্লিষ্ট করেন। মহাদেবের করুণায় ইনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন।

দুঃখের কথা, পরশুরামের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে গণেশ বাবাজির বহুকষ্টার্জিত হস্তীমুন্ডুর একটি দাঁত খোয়া যায়। গপ্পটি এইরকম: বাবা-মা ঘরের ভিতরে শুয়ে আরাম করছেন, পুত্র গণেশ

দরজা আগলে বসে আছেন, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। হেনকালে গোঁয়ারগোবিন্দ পরশুরামের আবির্ভাব। একুশ বার পৃথিবীকে যিনি নিঃক্ষত্রিয় করেছেন তাঁর ভয় কাকে? তিনি মহাদেবের সঙ্গে তখনই দেখা করতে চান। পিতৃভক্ত গণেশও কিছুতেই পরশুরামকে ঢুক্তে দেবেন না। বাধল প্রবল লড়াই। আর তাতেই বেচারির একটি দাঁত যায় ভেঙে। সেইজন্যই লোকে তাকে 'একদন্ত' বলে।

দক্ষ ও ছাগমুন্ড প্রতিস্থাপন

মুন্ড-প্রতিস্থাপনে প্রাচীন ভারতীয়দের দক্ষতা ছিল অসামান্য। শুধু হাতি নয়, ছাগলের মুন্ডু প্রতিস্থাপনে গপ্পোও তাঁরা লিখে গেছেন। আর সে-কাহিনিতেও দক্ষ আছেন কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। তাঁর সঙ্গে জামাই বাবাজীবনের সম্পর্কটি ছিল আদায় কাঁচকলায়। একবার বিশ্বস্রষ্টাগণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে সমস্ত দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হন। দক্ষ প্রজাপতি এই যজ্ঞে উপস্থিত হলে সকল দেবতাই দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, কেবল তাঁর জামাই মহাদেব ও

ব্রহ্মা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াননি। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবনিন্দা আরম্ভ করেন। এর কিছুদিন পর দক্ষ এক মহাযজ্ঞে ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন--শুধু সস্ত্রীক মহাদেব বাদ। দক্ষকন্যা, মহাদেব-পত্নী সতী সেই যজ্ঞের কথা শুনে বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে উপস্থিত হবার জন্য স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহাদেব অনুমতি না দিলেও সতী স্বামীর বাক্য উপেক্ষা করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। তখন কন্যার সামনেই দক্ষ তাঁর জামাতা মহাদেবের নিন্দা করতে আরম্ভ করেন। স্বামীনিন্দায় অপমানিত হয়ে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত শিবের অনুচরেরা অস্ত্রাঘাতে শ্বশুরমশায়ের, অর্থাৎ দক্ষের শিরশ্ছেদ করে। দক্ষের ছিন্ন শির যজ্ঞের অগ্নিতে ভস্ম করা হয়। ব্রহ্মা তখন বহুকষ্টে শিবকে তুষ্ট করে দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। মহাদেব বলেন, ছাই হয়ে যাওয়া মুন্ডু তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না ; তবে যদি একটা ছাগলের মুন্ডু আনতে পারো, সেটা শ্বশুরমশায়ের ঘাড়ে বসানো যেতে পারে। ব্রহ্মা তখন দক্ষের শিরস্থানে এক ছাগমুন্ড সংযুক্ত করেন। দক্ষ জীবিত হয়ে যজ্ঞ সম্পুর্ণ করে মহাদেবের স্তবগান করতে থাকেন। নবমুন্ড এবং নবজীবনপ্রাপ্ত দক্ষর কণ্ঠটি শোনাচ্ছিল তা অবশ্য পুরাণকার লেখেননি।

অতএব ধড়ে মুন্ড প্রতিস্থাপনে প্রাচীন ভারতীয়রা যে পটু ছিল তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু কী ছিল এর প্রযুক্তি? সে-প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমরা দ্বারস্থ হব পৌরাণিক নয়, কলিযুগের পরশুরামের, যার আরেক নাম ছিল রাজশেখর বসু।

দুই

পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু রসায়ন, অভিধানশাস্ত্র, ম্যানেজমেন্ট, সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা হিউমারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি 'যদু ডাক্তারের পেশেন্ট' নামে একটি গল্প লেখেন। তাতে ওপরে বর্ণিত অলৌকিক প্রতিস্থাপনের তান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেন। কী সেই ব্যাখ্যা? সেটা বুঝতে গেলে আগে যদু ডাক্তার সম্বন্ধে একটু জেনে নিতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই সেটা জানেন, তাঁরা একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।

১৯৫২ সালে ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সভাপতি ডাক্তার যদুনন্দন গড়গড়ির বয়স নব্বই। 'প্রায় পঁচিশ বছর প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ইনি এখন ধর্মকর্ম সাধুসঙ্গ আর শাস্ত্রচর্চা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ক্লাবের বাড়িটি ইনিই করে দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ সদস্যগণ একে আজীবন সভাপতি নির্বাচন করেছেন'। যদু ডাক্তার যেসময় সার্জারি করতেন, 'তখন তাঁদের সালফা পেনিসিলিন আর স্ট্রেপ্টো ক্লোরো না টেরা কি বলে গিয়ে--এসব রেওয়াজ হয়নি।

তরুণ যদু বিঘোরানন্দ নামক এক তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষের ভক্ত ছিলেন। একবার মাঝরাতে বাবার আশ্রম থেকে জরুরি ডাক এল। আশ্রমে যেতে বাবা তাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। দেখলেন, মেঝেতে 'একটা মাদুরের ওপর দুজন পাশাপাশি চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে, একখানা কম্বল দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা, শুধু মুখ দুটো বেরিয়ে আছে'। একজন তরুণ আর একজন তরুণী। বিঘোর বাবা বললেন, এরা প্রেমিক-প্রেমিকা। 'স্টেথোস্কোপটি গলায় ঝুলিয়ে হেঁট হয়ে কম্বলখানা আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেললুম। তাঁর পরেই এক লাফে পিছনে ছিটকে এলুম। কম্বলের নীচে কিছু নেই শুধু দুটো মুন্ডু পাশাপাশি শুয়ে আছে। . . . পুরুষ-মুন্ডুটা পিটপিট করে তাকিয়ে চিঁ-চিঁ করে করে বলছে, মরি নি ডাক্তারবাবু। মেয়ে-মুন্ডূটাও ডাইনে-বাঁয়ে একটু নড়ে উঠল'। ঘরের অন্য কোণে আর একটি কম্বলের নীচে শুয়ে আছে ধড় দুটি। তারাও মরেনি। মেয়েটির নাম পঞ্চী, সে বিবাহিতা, কিন্তু ভালোবাসে জটীরাম নামের অন্য পুরুষকে। পঞ্চীর বর রমাকান্ত কামার দুটোকেই রাম-দা দিয়ে কেটেছে। বিঘোরানন্দ ওদের বাঁচিয়ে রেখেছেন তন্ত্রসাধনার জোরে। যদু ডাক্তারকে ঐ জ্যান্ত ধড় আর জ্যান্ত মুন্ডু সেট করে জুড়ে দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন বাবা। কারণ, 'আমি মৃতসঞ্জীবনী জানি, কিন্তু খণ্ডযোজনীবিদ্যা আমার আয়ত্ত নয়। ও হল মুচী বা ডাক্তারের কাজ'।

এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল। 'সূক্ষ্মশরীর ভাগ হয় না, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। তাঁর অ্যানাটমি অন্য রকম। কতকটা অ্যামিবার মতন, কিন্তু ঢের বেশি ইলাস্টিক। ধড় আর মুন্ডু তফাতে থাকলেও সূক্ষ্মশরীর চিটে গুড়ের মতন বেড়ে গিয়ে দুটোতেই ভর করতে পারে'।

যদু ডাক্তার গদ্গদ হয়ে বললেন, 'ধন্য আপনার সাধনা, বিলিতি

বিজ্ঞানের মুখে আপনি জুতো মেরেছেন। . . . কিন্তু বাইরের চামড়া সেলাই করলেই তো গলার হাড় আর নলী জুড়বে না। সার্কুলেশন, রেস্পিরেশন, এবং স্পাইন্যাল কর্ডের সঙ্গে ব্রেনের যোগাযোগ কি করে হবে? সেরিব্রেশন অর্থাৎ মস্তিস্কের ক্রিয়া চলবে কি করে?'- 'কেন চলবে না? দুই ভুরুর মধ্যে আজ্ঞাচক্র ঘুরছে, তাতেই পঞ্চেন্দ্রিয় আর মনের ক্রিয়া চলছে। . . . কোনও চিন্তা নেই, দেখছ না, কাটা জায়গায় গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করে দিয়েছি। ঐ কাদা সুদ্ধ সেলাই করে দাও, বাকিটুকু কুলকুণ্ডলিনী আপনিই করে নেবেন'। প্রদীপ থেকে রেড়ির তেল নিয়ে ছুঁচ আর সুতো 'লুব্রিকেট' করে নিতে বললেন বাবা। আরও বললেন, সেলাইয়ের ঠিক পরেই জটিরামের গাঁজা খাওয়া বারণ, 'কারণ গলার জোড় পোক্ত হতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগবে। এখন খেলে সেলাইয়ের ফাঁক দিয়ে সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে'।

এরপরের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর। পঞ্চীর বুদ্ধি অনুযায়ী, একজনের মুন্ডু অন্যজনের ধড়ে জুড়ে দিতে বললেন বিঘোরানন্দ। যদু ডাক্তার তাই করলেন। পঞ্চীর ঘাড়ে জটির মুন্ডু আর জটির ঘাড়ে পঞ্চীর। প্রকৃতই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

ক্লাইম্যাক্স এর দু বছর পরে। বিঘোর বাবার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এল জটি-পঞ্চীর ছেলের অন্নপ্রাশনের। গিয়ে 'দেখলুম, . . . পঞ্চী তাঁর মস্কিউলার মোদ্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটিরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে'।

তিন

পুরাণ হল, তন্ত্র হল, এবার আসা যাক বিজ্ঞানে। অঙ্গ প্রতিস্থাপন ব্যাপারটা নিয়ে এত ঝামেলা কেন? আসুবিধেটা ঠিক কোথায়? এর উত্তরের জন্য পিটার মেডাওয়ার এর শরণাপন্ন হওয়া যাক।

পিটার মেডাওয়ার (১৯৫১-১৯৮৭)-এর জন্ম ব্রেজিলে। বাবা লেবাননের লোক, মা ব্রিটিশ। লেখাপড়া করেন ইংল্যান্ডে। বিষয় প্রাণীবিদ্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হাওয়ার্ড ফ্লোরির ল্যাবে পেনিসিলিন ওষুধ তৈরির গবেষণায় যোগ দেন। যুদ্ধে মারাত্মকভাবে দগ্ধ সৈন্যদের দেহে অন্য মানুষের ত্বক প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে মেডাওয়ার দেখেন, একজনের শরীরে অন্যজনের শরীর থেকে নেওয়া ত্বক বসানো যাচ্ছে না, শরীর সেটা প্রত্যাখ্যান করছে। এই প্রত্যাখ্যানের কারণ নিয়ে গবেষণায় মাতলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, প্রতিটি মানুষের শরীরে যে-ইমিউনোলজিকাল সিস্টেম থাকে, সেটি একান্তই তাঁর নিজস্ব। অর্থাৎ একজনের ইমিউনোলজিকাল সিস্টেম অন্যজনের চেয়ে আলাদা। ফলে একজনের ইমিউনোলজিকাল সিস্টেম অন্যজনের দেহ থেকে নেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অবাঞ্ছিত মনে করে এবং প্রত্যাখ্যান করে। শরীরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যই প্রকৃতি এই অত্যন্ত জরুরি কৌশলটি বানিয়েছে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, তাহলে কি কোনো অবস্থাতেই এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা যাবে না?

একই প্রশ্ন ভাবাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার এক ভাইরাসবিদকে। তাঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক ম্যাকফার্নেল বার্নেট (১৮৯৯-১৯৮৫)। তিনি একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। হতে পারে, একজন ব্যক্তির ইমিউনোলজিকাল সিস্টেম তাঁর 'নিজস্ব' , কিন্তু তাই বলে সেটা যে 'সহজাত', তা তো না-ও হতে পারে। 'নিজস্ব', কিন্তু 'সহজাত' নয়—এটাই হল বার্নেট-এর তত্ত্বপ্রস্তাবের চাবিকাঠি। সহজাত হলে সেটাকে বদলানো যাবে না; কিন্তু নিজস্ব হলে যাবে। কোন টিসুটি তাঁর নিজস্ব ও প্রয়োজনীয়, আর কোন টিসুটি বহিরাগত আর অবাঞ্ছিত, তা দেহকোষ নির্ণয় করে কী করে? তিনি বললেন, দেহকোষ ওই ক্ষমতা একচোটে নিয়ে আসে না, একটু একটু করে অর্জন করে, 'শেখে'। সুতরাং কোনো বহিরাগত টিসু বা অঙ্গ যদি একই সঙ্গে প্রয়োজনীয়ও হয়, সে টিসুকে বা সে অঙ্গকে প্রত্যাখ্যান 'না-করবার শিক্ষা' কি ইমিউনোলজিকাল সিস্টেমকে দেওয়া সম্ভব নয়?

কিন্তু বিজ্ঞান তো আকাঙ্ক্ষা আর অনুমানের ওপর চলে না, তার চাই অকাট্য পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ। সেই প্রমাণ সংগ্রহর কাজে নামলেন মেডাওয়ার। ইঁদুরের ভ্রূণ নিয়ে কাজ করে দেখালেন, বার্নেট-এর অনুমান সত্য। একজনের দান-করা ত্বক বা অঙ্গ গ্রহণ করার 'শিক্ষা' অন্যজনের ইমিউনোলজিকাল সিস্টেমকে সত্যিই দেওয়া যায়। এরই ফলে প্রতিস্থাপন সমস্যার সমাধান হয়। এরই জন্য বার্নেট আর মেডাওয়ারকে ১৯৬০ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং এরই দৌলতে অঙ্গ বা টিশু প্রতিস্থাপন আজ অনেক কম বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

অজানন, গজানন, জটি-পঞ্চীদের অবশ্য এসবের প্রয়োজন হয়নি। তাদের পাশে ছিল সাক্ষাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-বিঘোরানন্দ। মেডাওয়ার-বার্নেটদের পাশে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু নেই। সুবক্তা, সুরসিক, সুদর্শন, সংস্কৃতিমান ও সর্বজনপ্রিয় পিটার মেডাওয়ার মানুষটি ছিলেন আপসহীনভাবে না-ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কার্ল পপারের বিজ্ঞান-দর্শনের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তাঁর। মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদানের বিষয়ে ছিলেন গভীরভাবে আশাবাদী। মনোবলে স্ত্রী জিন-এর সহায়তায় তিনি তার পরেও সীমিত মাত্রায় গবেষণা চালান। কিন্তু এর পর একাধিকবার তাঁর স্ট্রোক হয়। অবশেষে একেবারেই চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েন। সেই অবস্থাতে নানা বিষয়ে লেখালিখি শুরু করেন। অসাধারণ উইট-ঋদ্ধ গদ্য লিখতেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'মেমোয়ার অব এ থিংকিং র্যা ডিশ' (চিন্তাশীল এক মুলোর স্মৃতিকথা) খুবই বিখ্যাত।

জীবনে এতরকম কষ্ট পেয়েছেন মেডাওয়ার, কিন্তু 'তা সত্ত্বেও আমি যথাকালে একটু আধটু প্রায়শ্চিত্ত করার কথা ভাবিনি। আমার দু-দুটো অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্য আমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দিইনি। আবার, তিনি যে আর দুটো অঙ্গ নষ্ট করে দেননি, তাঁর জন্যও তাঁকে ধন্যবাদ জানাইনি, তাঁর স্তুতিও করিনি। এই দুটো অসুখের সময়েই আমি কখনো ধর্মর কাছ থেকে কোনো শান্তি পাইনি, আমার একবারও মনে হয়নি যে ঈশ্বর আমার দেখভাল করছেন।' ভলতেয়ার-এর একটি কথা তাঁর খুব প্রিয় ছিল: 'নিজের বাগান চাষ করুন।' নইলে সাজানো বাগানও শুকিয়ে যায়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক।

সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন অপউন্নয়ন—এসব নিয়ে ভাবতে গেলে, এইসব জিনিসকে মানুষের কাছে মূল্যবান বলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর ভোটভিত্তিক সংসদীয় রাজনীতি হোক আর অন্য কোনো ধরনের রাজনীতি হোক, তাতে স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন দারিদ্র্য এসবের ওপরেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু কি একালে কি সেকালে, রাজনীতি মানুষকে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত করেছে, আর অধুনা ভোটের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব খুব বেড়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেশের উন্নতির মূল বিষয়, অর্থাৎ মানুষের অবস্থার উন্নতি, সেটাকেই গৌণ করে দিচ্ছে। তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির এক প্রধান স্তম্ভ, পরধর্ম সহিষ্ণুতা বনাম পরধর্ম অসহিষ্ণুতা—এ নিয়ে দু-চার কথা আমাদেরও বলতে হচ্ছে।—সম্পাদক, স্বাস্থ্যের বৃত্তে।

সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা নিয়ে আজকাল খুব কথা চালাচালি হচ্ছে। কেন্দ্রর শাসকদলের নেতা ও দরদিরা বলছেন: ইতিউতি কিছু খুনজখম ইত্যাদি হয়ে থাকলেও, অমন চিরকালই হত; তাতে সরকারের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগে না। সরকার তথা শাসকদল সহিষ্ণুতারই পক্ষে; বহুত্ববাদই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। আর অন্যরা মনে করেন: সরকার অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, তার জন্যেই ভারতের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এর জবাবে শাসকদলের বক্তব্য: দেশে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে-এমন বলা দেশদ্রোহর শামিল। জাতিসঙ্ঘর নিরাপত্তা পরিষদে যখন ভারতের সদস্য হওয়ার কথা চলছে, তখন এইসব অভিযোগ আনা ঘোর অন্যায়।

> সুসময়ে বন্ধু হওয়ার মতো সহিষ্ণু হতেও কোনো বাধা নেই। দুঃসময়ে সেই সহিষ্ণুতা কপ্পুরের মতো কোথায় উবে যায়।

ভারতের ঐতিহ্য মানেই বহুত্ববাদ,সব ধর্মমতের লোক গলাগলি করে বাস করছেন সবকালে সব অঞ্চলে—এমন দাবি করা কিন্তু চূড়ান্ত অনৈতিহাসিক। দুপক্ষর লোকই সে-কথা জানেন। ধর্মস্থান ধ্বংস, বিধর্মীদের ওপর অত্যাচার, বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা -এগুলো ইংরেজ আসার পর শুরু হয়নি, কোনো-না-কোনো চেহারায় এই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ভারতে গত আড়াই হাজার বছরে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে। বহুত্ববাদে বিশ্বাসী-এমন লোক আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। কিন্তু তার জন্যে বহুত্ববাদ আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য হয়ে যায় না।

আসলে মুশকিলটা এইখানে যে সহিষ্ণুতাকে এক স্থায়ী মনোভাব বলে ধরা হচ্ছে, যাকে নাকি বিশেষ দেশকালের অতীত বা ওপরে। ঘটনা অন্য। একসময়ে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহিষ্ণুতার অবতার, সময় বদলালে সেই একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে।'সময় বদলানো' মানে রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেওয়া। তারও পেছনে থাকে আর্থিক দুর্গতি । সুসময়ে বন্ধু হওয়ার মতো সহিষ্ণু হতেও কোনো বাধা নেই। দুঃসময়ে সেই সহিষ্ণুতা কপ্পুরের মতো কোথায় উবে যায়। তখনই শুরু হয় অন্য ধর্মর মানুষদের ওপর দমনপীড়ন, তাঁদের ওপর আলাদা করে বাড়তি কর ও শুল্ক চাপানো।

এর সবচেয়ে চেনা উদাহরণ—আকবর বনাম আওরঙজেব। অনেক হিন্দুরই ধারণা: প্রথম জন ছিলেন সহিষ্ণুতার প্রতীক , দ্বিতীয়জন অসহিষ্ণুতার। নিজে ধর্মপ্রাণ হয়েও আকবর সবধর্ম মিলিয়ে দিন-এ-ইলাহি (ঈশ্বরের ধর্ম) তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আওরঙজেবও ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান, কিন্তু হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে তাঁর অসহিষ্ণু মনোভাবই প্রমাণ করেছেন।

নিতান্ত সরলমতি বা অপরিণতবুদ্ধি না হলে যে কারুরই বোঝার কথা, স্রেফ অসহিষ্ণু মনোভাবের জন্যে কেউ বাড়তি কর চাপায় না। তাঁর পেছনের মতলব হচ্ছে, ফাঁকা রাজকোষে আরও কিছু আয়ের ব্যবস্থা। সব শত্রুকে বশে এনে, কোথাও বা কোনো রাজকন্যাকে বিয়ে করে আকবর তাঁর রাজস্ব আর দেশের শান্তি-দুই-ই নিশ্চিত করেছিলেন। সমৃদ্ধির সময়ে সহিষ্ণুতা দেখানো যায়, সবধর্ম সমন্বয়ের খোয়াব দেখা যায়। আর আওরঙজেবের সময়ে এখানে বিদ্রোহ, ওখানে বিদ্রোহ; এখানে শিবাজী, ওখানে অন্য কেউ। মোগল বাদশার তখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। রাজ্য চালাতে সাধারণত যা

খরচ হয়, কর ও খাজনা আদায় করতে পারলেই তা উঠে যায়। কিন্তু যুদ্ধ বাধলে খরচ বাড়ে। তাঁর টাকা আসবে কোত্থেকে? তখন বাড়তি কর চাপাতেই হয়। ধর্মীয় ভাগাভাগির সুযোগ নিয়ে সবচেয়ে বড়ো সম্প্রদায়ের ওপরেই কর চাপানো সুবিধে।

ধর্ম মাত্রেই বিভেদকে প্রশ্রয় দেয়, এক ধর্ম থেকে বেরিয়ে অন্য ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দলাদলি বাধে।

অর্থাৎ এখানে ধর্ম একটা অছিলা মাত্র, আসল কথা, আরও টাকা জোগাড়ের ফিকির। মনে করিয়ে দিই, আকবরের দিন-এ-ইলাহি-র স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল। ধর্ম মাত্রেই বিভেদকে প্রশ্রয় দেয়, এক ধর্ম থেকে বেরিয়ে অন্য ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দলাদলি বাধে। হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান বলতে ঠিক কী বোঝায় কেউ তা জানে না। বৈষ্ণবও হিন্দু, শাক্তও হিন্দু; শিয়াও মুসলমান সুন্নিও মুসলমান; ক্যাথলিকও খ্রিস্টান প্রটেস্টান্টও খ্রিস্টান; যদিও তাঁদের মধ্যে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি।

আকবর বাদশার বিষয়ে একটি খবর জানাই, সকলের হয়তো জানা নেই। আকবরের দরবারে মৌলানা-মৌলবিদের বেশ কদর ছিল। অনেক উঁচুদরের শাস্ত্রীয় বিচার হত। যেমন, কোনো চিতা যদি হরিণের ঘাড় কামড়ে ধরে তবে ধর্মীয় আইন মোতাবেক কী করে হরিণটিকে জবাই করা হবে। (ইরফান হবিব পৃ. ৩০০ টীকা ৮৬ দ্র.)। আকবরের উদারতা নিয়ে হিন্দুদের সংস্কার অনেককালের। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও গোড়ায় তা-ই বিশ্বাস করতেন। ভালো করে ইতিহাস পড়ার পর তাঁর বোধোদয় হল। তিনি লিখেছেন:

'অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হতেই বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আমরা মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গলা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রইল না, দিল্লীর আগ্রার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল'। (*বাঙ্গালার ইতিহাস*, পৃ.৪২৮)

ভালো বাদশা আকবর আর কালো বাদশা আওরঙজেব--এই ধারণাটা তাঁর মনে ব্রিটিশ আমলেও চালু ছিল। মজার ব্যাপার হল হিন্দুরা যখন মাথা ঘামাচ্ছেন—কোন মুসলমান বাদশা ভালো, বাদশারা কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিত নন। আকবর-জাহাঙ্গীর বরং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলায় বিশ্বাস করতেন। মোগল শাসন সম্পর্কে বঙ্কিম লিখেছিলেন:

'বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তির চিহ্ন আছ, পাঠানের অনেক কীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসরমাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্তির সংস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্তি কেহ দেখিয়াছে? কীর্তির মধ্যে 'আসল তুমার জমা (রাজস্ব নীতি)'। কীর্তির কি অকীর্তির বলিতে পারিনা, কিন্তু তাহাও একজন হিন্দুকৃত (টোডরমল') । (পৃ. ৪২৮)

যোলো শতকের নবজাগরণের পর কেন সবকিছু হারিয়ে গেল? বঙ্কিম লিখেছেন: 'এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা টোডরমল্লের আমলে তুমার জমার দোষে' (পৃ. ৪৩৭)।

রাজস্থানের হিন্দুরাজা মানসিংহকে জাহাঙ্গীর পাঠালেন বাঙলাকে শায়েস্তা করতে, বারো ভুঁইয়ার বিদ্রোহ দমন করতে । সেই ভুঁইয়াদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই-ই ছিলেন।

পথে বিপদের সময়ে মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন এক হিন্দু, ভবানন্দ মজুমদার। *অন্নদামঙ্গল*-এ ভারতচন্দ্র রায় তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের জীবনের ভালোমন্দর সবই তাঁর জানা ছিল। তবু প্রবল অত্যুক্তি সমেত প্রতাপাদিত্যর গুণাগুন করে তিনি লিখেছেন:

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্ত
নাহি মানে পাতসায় (বাদশায়) কেন নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভুপতি দ্বারস্থ।।
বরপুত্র ভবানির প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী
ষোড়শ হলকা (দল) হাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।।

প্রতাপাদিত্য তার কাকা বসন্ত রায়কে পরিবার পরিজন সমেত নিকেশ করলেন:

তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্তরায়
রাজা তারে সবংশে কাটিল।
তার বেটা কচুরায় রাণী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইল
ক্রোধ হইল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজ মানসিংহে পাঠাইলা
বাইশ লস্কর সঙ্গে কচু রায় লয়ে সঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা।।

(খন্ড ২, পৃ. ১৬১)

প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এই বিবরণের মিল নেই। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন:'অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে তাঁহার (প্রতাপাদিত্যের) শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির যে উচ্ছ্বাসিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই'(পৃ. ১৩১)। ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি একই সিদ্ধান্তে এসেছেন:

'প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন—এবং শেষ অবস্থায় মুঘলদের সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত কাহিনী তাঁহার সমর্থন করে না' (পৃ. ১৩৭)।

কিন্তু ইংরেজপূর্ব বাঙলার লোক-প্রচলিত ইতিহাস ছিল অন্য। রামরাম বসু ('রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র') ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ('বঙ্গাধিপ-পরাজয়') সেই ইতিহাস অনুসরণ করেছেন। পোর্তুগিজ ও ইংরেজ ইতিবৃত্তকাররাও তাঁর বাইরে কিছু বলেননি। *বঙ্গাধিপ-পরাজয়*-এ নতুন সংস্করণে তাঁর সবই দেওয়া আছে (পৃ. ৩৯৯-৪১৮)। ভুপেন্দ্রনাথ দত্তও তাঁর *বাঙ্গালার ইতিহাস*-এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (পৃ.১০৪-৩৬)। দিল্লির বাদশা বা তাঁর প্রতিনিধি

ধর্ম হচ্ছে সুড়সুড়ি দিয়ে লোক খ্যাপানোর সবচেয়ে উপযুক্ত আবেগ। তার কারণ, ধর্মর পেছনে কোনো তথ্য বা যুক্তি নেই, আছে শুধু অন্ধবিশ্বাস।

সম্পর্কে লোক-প্রচলিত ইতিহাসে বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তবু ব্রিটিশ আমলে বাঙালি হিন্দুর এত আকবর-প্রীতি এল কোত্থেকে? আঠার-উনিশ শতকে নয়, বিশ শতকের গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বারো ভুঁইয়াদের নিয়ে নাটক লেখা হল, অভিনয় হল। তাঁর কয়েক দশক পরেও সেসব নাটকের জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। দক্ষিণ কলকাতায় এখনও প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায়ের নামে দুটি রাস্তা আছে। অথচ তারই পাশাপাশি ভালো আকবর ও কালো আওরঙজেব (ইংল্যান্ডের ইতিহাসে 'বদ রাজ নন' আর 'ভালো রানি বেস' তত্ত্বর মতো) কী করে চালু থাকল সেটি গবেষণার বিষয়।

আকবরের উদারতার পেছনেও রয়েছে রাজস্ব আদায়ের কৌশল, আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণতার পেছনেও তা-ই। এই হল ইতিহাস বিচারের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই সরল সত্যটি ভুলে গিয়ে, আকবর ও আওরঙ্গজেবের মনোবিশ্লেষণ করে যারা সহিষ্ণুতা- অসহিষ্ণুতার দুই প্রতিনিধি দেখতে পান, তারা আসলে জ্ঞানপাপী, কেউ কেউ হয়তো অজ্ঞানপাপী। ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা, এমনকী দলীয় নীতি ও কর্মসূচির ছাপা বই থেকেও ধরা যাবে না কে সহিষ্ণু আর কে অসহিষ্ণু। মুখে বা লেখায়ও বোঝা যাবে না—সহিষ্ণুতার কথা বলে কাজে অসহিষ্ণু হওয়াই নিয়ম। দেশের আর্থিক হাল ভালো হলে সব দলই, এমনকী ভাজপা-ও সহিষ্ণুতা দেখাবে। আর হাল খারাপ হলে চেহারা বদলে যাবে। ধর্ম হচ্ছে সুড়সুড়ি দিয়ে লোক খ্যাপানোর সবচেয়ে উপযুক্ত আবেগ। তার কারণ, ধর্মর পেছনে কোনো তথ্য বা যুক্তি নেই, আছে শুধু অন্ধবিশ্বাস। সেই আবেগটিকে ভালোমতো চাগাতে পারলে অযুক্তির সদরদোরটি হাট করে খুলে দেওয়া হয়। চাপা পড়ে যায় রাজনীতি-অর্থনীতির সব তথ্য।

যেসব উদাহরণ দিলুম তাঁর থেকে এমন মনে করলে ভুল হবে যে, শুধু মোগল আমলেই এমন ঘটেছিল। ভারতের ইতিহাসে বারেবারেই এর নমুনা পাওয়া যায়। কনৌজের সম্রাট হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য একই সঙ্গে গৌরী, মহেশ্বর শিব ও সুর্য-উপাসক ছিলেন। আবার বৌদ্ধধর্ম তিনি অশ্রদ্ধা করেননি। এ হল সাত শতকের কথা। একই সময়ে বাংলার রাজা নরেন্দ্রগুপ্ত-শশাঙ্ক মগধে হানা দিলেন, গয়া-র বোধিবৃক্ষটি কেটে ফেললেন,আর যেখানে যেখানে বৌদ্ধবিহার ইত্যাদি ছিল, সেগুলি চুরমার করে দিলেন। একই সময়ে দুই অঞ্চলের দুই রাজার বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে এমন অনুরাগ ও বিরাগ কেন? মার্কসবাদী ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী বলেছেন: বাইরে থেকে দেখলে শত্রুতার ধারণাটি ধর্মীয় মনে হলেও আসলে সেটি অর্থনৈতিক (১৯৬২, পৃ. ২৯-৩০)।

এ ব্যাপারে অবশ্য সেরা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কাশ্মীরের ইতিহাসে। *রাজতরঙ্গিণী*-তে বলা হয়েছে: কাশ্মীরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহ (দেবমুর্তি) ভেঙে ফেলেছিলেন আর এক রাজা হর্ষ (খ্রিস্টাব্দ ১০৮৯-১১০১)। এই বিগ্রহ ধ্বংসর কাজ ঠিকমতো পরিচালনার জন্যে একটি বিশেষ পদ তৈরি করা হয়েছিল। কোনো রাখঢাক না করে সে পদের নাম দেওয়া হয়েছিল: দেবোৎপাটন-নায়ক। হিন্দু রাজা হয়েও হর্ষ এ কাজ করেছিলেন কেন? স্থানীয় কিছু ভূস্বামী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে কাশ্মীররাজের রাজকোষে টান পড়েছিল। বিগ্রহগুলি গলিয়ে তবেই সেই সেই টাকার ব্যবস্থা করা যেত। কালাপাহাড় না হয় বিধর্মীদের ওপর আক্রোশেই মূর্তি ধ্বংস করতেন, কিন্তু স্বধর্মীদের ওপর এমন অত্যাচার করেননি। কাশ্মীররাজ হর্ষ এ ব্যাপারে খুবই নিরপেক্ষ ছিলেন। হিন্দুমন্দির ও বৌদ্ধবিহার কোনোটিই তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি।

কোসম্বী খুব সাঁটে ব্যাপারটি বলেছেন। আরও ছড়িয়ে ব্যাপারটি দেখা যাক। *রাজতরঙ্গিণী*-র বিবরণটি এই রকম।

রাজা হর্ষদেব তাঁর মন্ত্রীদের কথায় উঠতেন বসতেন। এক মন্ত্রী তাকে বোঝালেন মন্দিরে অনেক ধনরত্ন থাকে; সেগুলো লুঠ করলে বিস্তর সম্পদ পাওয়া যাবে।

'রাজা সৈন্যদলকে নানাভাগে বিভাগ করিয়া ব্যয়বহুল্য ঘটাইয়াছিলেন। এক্ষনে ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য একমাত্র মন্দির লুণ্ঠনই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিলেন। অর্থগৃধ্নু রাজা এইরূপে পুর্বরাজগণের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ধনরত্নাদি অপহরণ করিতে লাগিলেন।

রাজা মন্দিরস্থ ধনরত্নাদি অপহরণ করিবার পর দেবমূর্তিগুলি উৎপাটন জন্য উক্ত কার্য্যে পারদর্শী উদয়রাজের উপর ভারাপর্ণ করিয়াছিলেন। (৭।১০৮৯-৯১)

এই রাজা হর্ষদেব কিন্তু হিন্দুই ছিলেন। মহেশ্বের (শিব) ছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। মহেশ্বরের নাম করতে করতেই তিনি প্রাণ হারান।(৭।১৭১২)। তবু দেব-উৎপাটন-নায়ক, সরকারি ইংরেজিতে বলা যায় 'অফিসার ইন-চার্জ/প্রিফেক্ট অফ আপরুটিং আইডলস'

নিয়োগ করতে তাঁর বাধেনি। শুধু তা-ই নয়। কলহন লিখেছেন:

'রাজা দেবমুর্তিগুলি অপবিত্র করিবার মানসে নাসিকা চরণ ও হস্তাদিহীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দ্বারা তাহাদের (বিগ্রহগুলির) উপর মলমূত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

স্বর্ণ রজত ও অন্যান্য ধাতুনির্মিত দেবমুর্তিগুলি মলদূষিত হইয়া পথিপার্শ্বে ইন্ধন কাষ্ঠের ন্যায় পড়িয়াছিল।

নগ্ন, কুষ্ঠি ভিক্ষুকেরা চরণে রজ্জুবদ্ধাবস্থায় নীয়মান দেবমূর্তিগুলির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছিল।

কোন গ্রামে, উপনগরে বা রাজধানীতে এমন একটিও দেবালয় ছিলনা যাহা, ম্লেচ্ছ হর্ষরাজ কর্তৃক বিগ্রহশূন্য হয় নাই। (৭।১০৯২-৯৫)

অনুবাদে যাকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়েছে মূলে সেখানে আছে 'তুরস্ক' অর্থাৎ তুরস্ক দেশের লোক বা মুসলমান। হর্ষ কিন্তু আদৌ মুসলমান ছিলেন না, ধর্মপ্রাণ হিন্দুই ছিলেন (ঠাট্টা করে কোসম্বী লিখেছেন—ধরা যায় 'গীতা'-ও পড়তেন (১৯৬২,পৃ.২৯)। আর বৌদ্ধদের দিয়ে বিগ্রহ অপবিত্র করার ঘটনা থেকে যদি কেউ মনে করেন তিনি বৌদ্ধ বা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি ভুল করবেন। হিন্দু-বৌদ্ধ- নির্বিশেষে সব মন্দিরই হর্ষদেব লুঠ করতেন। শুধু দুটি প্রভাবশালী হিন্দু মন্দিরে তিনি হাত দেননি—শ্রীনগরের রণস্বামী মন্দির আর পত্তনের মার্ত্তণ্ড (সূর্য) মন্দির। তেমনি দুজন বৌদ্ধর প্রার্থনায় দুটি বৌদ্ধ মন্দির রক্ষা পেয়েছিল (৭।১০৯৬-৯৮)।

গরজ বড় বালাই। শুধু মন্দির লুঠ করেই, বিগ্রহ গলিয়ে রাজার খাঁই মেটেনি। কলহণ জানিয়েছেন:

'রাজা হর্ষ প্রজার ধনহরণোদ্দেশে নানারূপ অর্থনায়কত্বের পদ সৃষ্টি করিয়া অবশেষে পূরীষের উপরও একটা কর ধার্য করিয়া সেই কর আদায়ের জন্য একজন নায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন'। (৭।১১০৭)

তাহলে 'দেবোৎপাটিন নায়ক' থেকে শুরু করে মানুষের বিষ্ঠার ওপরে কর আদায়ের জন্যে নায়ক (রণজিৎ সীতারাম পণ্ডিত এর অনুবাদ করেছেন *দ্য প্রিফেক্ট অফ নাইট সয়েল*) নিয়োগ করে হর্ষদেবকে নিজের গদি বজায় রাখতে হয়েছিল। তাঁর অবস্থা যখন ভালো ছিল তখন তিনি অকাতরে দান করতেন, বিদ্বানদের সম্মান করতেন, অন্তঃপুরে অভিনয় শেখাতেন, চমৎকার গীত রচনা করতেন। এর করুণ রসের গান শুনে লোকে চোখের জল ধরে রাখতে পারত না।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন: সহিষ্ণুতা বা অসহিষ্ণুতা কোনো দেশের বা কোনো বিশেষ ধর্মের স্থায়ী লক্ষণ নয়। সবটাই নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। আর সেই পরিস্থিতিও নির্ভর করে আর্থিক অবস্থার ওপর। অবস্থাবিশেষে অসহিষ্ণুও সহিষ্ণু হয়, সহিষ্ণুও অসহিষ্ণু হয়। ধর্মগ্রন্থে যা-ই বলা থাক, ধর্মান্তর করা যাক বা না যাক, বলির পাঁঠার দরকার পড়লে পরধর্মের লোককেই বেছে নেওয়া সুবিধে। যুগে যুগে খ্রিস্টানরা বেছে নিয়েছেন ইহুদিদের, হিন্দু ও মুসলমানরা বেছে নিয়েছেন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মর নিরীহ মানুষদের। যাদের ইন্টারনেট দেখার সুযোগ আছে তারা একবার আইকনোক্লাজম (Iconoclasm) লিখে দেখবেন। কে মুর্তি ধ্বংস করেনি সেইটে খোঁজাই বরং বড়ো কাজ। পরবর্তীকালে বাইজান্টাইন সম্রাটরা একই কাজ করেছিলেন। আর্থিক সমস্যাই ছিল গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার একমাত্র কারণ (*রাজতরঙ্গিনী*, ইংরিজি তর্জমা, পৃ. ৩৫২ টীকা)। পশ্চিম ইউরোপে ষোলো-সতেরো শতকে নবজাগরণ (রেনেসাঁস) ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন রিফরমেশন)-এর উজ্জ্বল দিনগুলিতেও ডাইনি সন্দেহে হত্যার পাশাপাশি বিগ্রহ ধ্বংসের দৃষ্টান্ত শ-য় শ-য় পাওয়া যায়। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করতে যাদের হাত কাঁপেনি তাদের দোসর সব ধর্মেই আছে। আর শুধু ধর্ম কেন, যেকোনো বিশেষ মতাদর্শে যাদের মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তারাও পরমতের ওপর গাজোয়ারি করে নিজেদের দেউলিয়াপনাই প্রকাশ করে। এর জন্যে শুধু ব্যক্তি বা শুধু মতবাদকে দায়ী করলে আসল শত্রু পার পেয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও অন্ধতার কারণে রাজশক্তি বিধর্মীদের প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখায়; কোথাও বা তালিবান-এর মতো গোষ্ঠী নিছকই ধর্মীয় ভাবাবেগের বশে অসহিষ্ণুতার রুদ্ররূপ দেখায়। অবশ্য শুধু ধর্মমত নয়, রাজনৈতিক মতান্ধতার কারণেও মূর্তি ভাঙার মতো শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। তবে সেগুলি দেববিগ্রহ নয়, মনীষীদের মর্মরমূর্তি। তবে এসবই সাময়িক উত্তেজনা। কিন্তু যেখানে অসহিষ্ণুতার পর্বটি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে, তাঁর পেছনে কাজ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। তাঁর চাপে নিপাট ভালোমানুষও বিগড়ে যায়, পরধর্মর লোকের ওপর কর বসায়, মন্দির মসজিদ ভাঙে, এমনকী ঠান্ডা মাথায় খুন করে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে: ভারতের ইতিহাসে কি ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কোনো নিদর্শন নেই? হ্যাঁ, আছে। মগধের সম্রাট অশোক তাঁর অসামান্য দৃষ্টান্ত। ছ-টি জায়গায় পাথরে খোদায় করে তিনি লিখে রেখেছিলেন: 'দেবতাদের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন সর্বত্রই সব ধর্মসম্প্রদায় (পাসংড) বাস করুক'। কথাটা এমনিতে খুবই তুচ্ছ শোনায়, কিন্তু এর তাৎপর্য বিরাট। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-র বিধান ছিল ধর্মশিক্ষকরা রাজার অধিকৃত গ্রামে ঢুকতে পারবেন না (২।১।৩২) আর সম্প্রদায়নির্বিশেষে সব ধর্মশিক্ষককে সব জায়গায় যেতে উৎসাহ দিচ্ছেন অশোক। কোসম্বী বলেছেন, অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছেন না, সাধারণভাবে নৈতিকতাও নয়। তিনি বরং ঘোষণা করছেন ন্যায়বিচার, সামাজিক নীতিবোধের শ্রেষ্ঠত্বকে। এটিকেই তিনি নগ্ন বল প্রয়োগের ওপরে রাখতে চান (১৯৭৫,পৃ.২০৩)। কিন্তু এ হল, যাকে বলে, বিরলের মধ্যেও বিরলতম দৃষ্টান্ত। শুধু ভারতে নয়, সারা দুনিয়ায়।

আগেই বলেছি, ধর্মবিশ্বাস একান্তভাবেই আবেগনির্ভর। অসহিষ্ণুতাকে তাই সহজেই জাগানো যায় বিশ্বাসীর মনে, আবেগ উসকে লোক জোটানো সহজ। তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে পালটা আবেগ উসকানোর রাস্তায় গিয়ে কোনো লাভ নেই। এমনকী মানুষের

শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন রাখাও বৃথা। চেষ্টা করতে হবে মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলার, সঠিক তথ্যপ্রমাণ বিচার করে ঠান্ডা মাথায় যাতে উচিত-অনুচিত ঠিক করা যায়। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, সাক্ষর কিন্তু অশিক্ষিত মতলববাজরা তাঁদের কাজ হাসিল করতে চায়। তাঁর বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য, ইতিহাসের প্রমাণ লোকের সামনে তুলে ধরা খুবই জরুরি। তাঁর বদলে ধর্মসমন্বয়, ‘যত মত তত পথ’ ইত্যাদি ফাঁপা বুলি আউড়ে কোনো ফায়দা নেই। অবশ্যই একদিনে এ কাজে সফল হওয়া যাবে না। কিন্তু কাজটা শুরু না হলে, বারে বারে অসহিষ্ণুতার উত্থান ঘটবে, আর তাঁর কাছে হার মানবে সদবুদ্ধি আর সহিষ্ণুতা। যুক্তিবাদের সপক্ষে প্রচারের কাজে ছেদ পড়লে চলবে না। অসহিষ্ণু সরকারের জায়গায় আপাত সহিষ্ণু সরকার এলেই সে কাজ শিকেয় তুলে অন্য কাজে লেগে পড়া - এতে কখনোই কোনো স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না। শত্রুপক্ষ অনেকদিন ধরে যা করতে চাইছে, তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইও হবে লম্বা মেয়াদের। এর জন্য সবাই তৈরি হোন।

রচনাপঞ্জি:

ইরফান হবিব। *মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)*। কে পি বাগচী, ১৯৮৫।

কলহণ। কলহণ-পণ্ডিত-বিরচিত *রাজতরঙ্গিণী*। রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ও দুর্গানাথশাস্ত্রী কাব্যরত্ন অনুদিত ও মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ভাগ ১। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩ (প্রথম প্রকাশ ১৩১৭-১৯)।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। *বঙ্গাধিপ-পরাজয়*। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় সম্পা.। সরসুনা এসোসিয়েশন-প্রতিভা লাইব্রেরী শতবার্ষিকী সংস্করণ,২০০৬।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ*। গোপাল হালদার প্রমুখ সম্পা.। সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩।

ভারতচন্দ্র রায়। *অন্নদামঙ্গল*। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৩৬।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। *বাঙ্গলার ইতিহাস*। চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৪ (পুনর্মুদ্রণ)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পা.। *বাংলা দেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ)*। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৩৯০ ব.।

Kalhana. *Rajatarangini, The Saga of the Kings of Kashmir.* Trans. R. S. Pandit, New Delhi: Sahitya Akademi, 1977 (first published 1935).

Kangle, R. P. (ed). *The Kautilya Arthasastra. Part I.* Bombay: University of Bombay, 1969.

Kosambi, D.D. *An Introduction to the Study of Indian History.* Bombay: Popular Prakashan, 1975 (first published 1956).

Kosambi, D.D. *Myth and Reality.* Bombay: Popular Prakashan, 1962. স্বাস্থ্যের বৃত্তে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: অমিতাভ ভট্টাচার্য, তরুণ বসু, সিদ্ধার্থ দত্ত।

লেখক দার্শনিক, অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, লোকায়ত দর্শন নিয়ে গবেষণায় নিরত।

Advt.

জিএসটি ও ওষুধের দাম

ভারতে GST বা পণ্য ও পরিষেবা কর চালু হওয়ার প্রায় এক মাস হতে চলল। জিএসটি ভারতের কর ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। আগেকার সমস্ত রকম ট্যাক্স যেমন, ভ্যালু আডেড ট্যাক্স (VAT), এক্সাইজ ডিউটি ট্যাক্স এসব উঠিয়ে দিয়ে সমস্ত রকম পণ্য ও পরিষেবা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সারা দেশে একই রকমের কর ব্যবস্থা লাগু করা হয়েছে। ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে অন্যান্য সমস্ত রকম পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের ওপরেও জিএসটি প্রযোজ্য হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই জিএসটি কী প্রভাব ফেলেছে তা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে। জিএসটি-র জন্যে কি ওষুধের দাম আগের তুলনায় বেড়েছে? জিএসটি-র জন্যে বাজারে ওষুধ জোগান কি আগের থেকে কমেছে? The Wire পত্রিকায় এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন **এস. শ্রীনিবাসন, ও টি. শ্রীকৃষ্ণ**। অনুবাদ করেছেন **ডা. অপূর্ব**।

১. জিএসটিতে বিভিন্ন ওষুধের ওপর ট্যাক্স কীভাবে ধার্য করা হয়েছে?

বিভিন্ন পণ্যের ওপর জিএসটি-র পরিমাণ এরকমভাবেই বসানো হয়েছে যাতে করে নতুন ট্যাক্সের পরিমাণ আগেকার ট্যাক্স ব্যবস্থার ভ্যালু আডেড ট্যাক্স ও এক্সাইজ ডিউটি ট্যাক্স মিলে মোট যতটা ট্যাক্স হত, তার মোটামুটি সমান দাঁড়ায়। আগের নিয়মে ভ্যাট ছিল ৫% আর এক্সাইজ ডিউটি ট্যাক্স ছিল সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের ৬৫%-এর ৬%। সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের মধ্যেই ভ্যাট আর এক্সাইজ ট্যাক্স ধরা ছিল। তার চেয়ে বেশি দামে কোনো জিনিস বিক্রি করার নিয়ম নেই। এখন জিএসটির জমানায় আলোপ্যাথিক মেডিসিন ও চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রের ওপর তিন রকম ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে, ৫%, ১২%, আর ১৮%। এছাড়া গর্ভনিরোধক মুখে খাওয়ার ওষুধ ও সঞ্চালনযোগ্য মানবরক্তের ওপর কোনো ট্যাক্স রাখা হয়নি। বেশিরভাগ ওষুধে নতুন জিএসটি বসেছে ১২%, যেখানে আগে ভ্যাট আর এক্সাইজ ডিউটি ট্যাক্স মিলে ৯.৫% ট্যাক্স ছিল। এছাড়া ওআরএস, ভ্যাকসিন, ইনসুলিন-- এসবের ওপর আগে যেখানে শুধু ৫% ভ্যাট ছিল (এক্সাইজ ডিউটি ছিল না), সেখানে এখন ৫% হারেই জিএসটি ধার্য হয়েছে।

কোন ওষুধের ওপর কত জিএসটি ধার্য করা হয়েছে তা জানা যাবে এই সূত্র থেকে—
http://www.gstcouncil.gov.in/gst-rates।

২. জিএসটি-র ফলে ওষুধের দামের কীরকম পরিবর্তন হয়েছে?

যে সব ওষুধের ওপর ১২% জিএসটি ধার্য হয়েছে সেইসব ওষুধের দাম ২.৩০% বেড়েছে। আর যে সব ওষুধ ওপর ৫% জিএসটি-র ঘরে, তাদের দামের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাত ১২% জিএসটি-র ওষুধের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য (MRP) ২.৩% বাড়ল আর ৫% জিএসটির ওষুধের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য একই থাকছে।

আমাদের গুজরাটে ওষুধের দামের ওপর জিএসটি-র এইরকম প্রভাবই পড়েছে। আপনাদের রাজ্যেও ছবিটা খুব একটা আলাদা হবে না। রাজ্যবিশেষে ভ্যাট ও এক্সাইজ ডিউটি ট্যাক্সের সামান্য হেরফের ছিল। সেই কারণে বর্তমানে দামের পরিবর্তন রাজ্যবিশেষে কিছুটা কম বেশি হতে পারে, তবে সেটা খুব বেশি নয়। রাজ্যবিশেষে কোনো কোনো ওষুধের ওপর আগে ভ্যাট বা এক্সাইজ ট্যাক্স ছিল না।

ক. যেসব ওষুধে ভ্যাট ও এক্সাইজ ট্যাক্স কোনোটাই ছিল না সেসব ওষুধের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ০%, ৫% ও ১২%, বর্তমান জিএসটি-র ট্যাক্স কাঠামোর কোন ঘরে তাদের রাখা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে।

খ. যেসব ওষুধে শুধু এক্সাইজ ট্যাক্স ছিল কিন্তু ভ্যাট ছিল না তাদের দাম বেড়েছে ৫% ও ১২% জিএসটি-র ওষুধের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ০.৯% ও ৭.৬%।

৩. জিএসটির ফলে সরকার কি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ (National List of Essential Medicines, 2015) ও নিয়ন্ত্রিত দামের ওষুধ (Price controlled Medicines)-এর দামের সর্বোচ্চ সীমা (Ceiling Price) বাড়িয়েছে?

হ্যাঁ। অত্যাবশ্যকীয় ও নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মূল্যের ওষুধের দাম সরকার বাড়িয়েছে। ১২% জিএসটি-র ওষুধের ক্ষেত্রে সেই ২.৩% হারেই।

যেসব ওষুধের দামের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই সেই সব ওষুধের ওপর প্রতি বছর এপ্রিলে ১০% দাম বাড়ানোর অনুমতি আছে Drug Price Control Order, 2013 মোতাবেক। এইসব ওষুধের ওপর জিএসটির ফলে নতুন করে ২.৩% দাম কিন্তু বাড়ানো হয়নি, কারণ এই সব ওষুধের দাম গত এপ্রিলেই সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত বেড়েছে।

৪. তাহলে এখন ওষুধের প্যাকেটে কোন দাম ছাপা থাকবে?

১ জুলাই, ২০১৭-এর আগে ওষুধ কোম্পানিগুলি যে পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ওষুধ তৈরি করে ফেলেছে সেগুলির প্যাকেটে স্টিকার মেরে ২.৩% বর্ধিত দাম ছাপাতে পারে। ১ জুলাই-এর পর তৈরি সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্যাকেটে ২.৩% বর্ধিত এমআরপি ছাপা থাকবে।

৫. ৫% জিএসটি-র ওষুধের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তাহলে কীরকম দাঁড়াচ্ছে?

এসব ওষুধের ক্ষেত্রে দাম যেহেতু একই থাকছে তাই এইসব ওষুধের প্যাকেটে স্টিকার লাগিয়ে দাম বাড়ানো বেআইনি।

৬. কোনো কোম্পানি ১২% জিএসটির ওষুধের ক্ষেত্রেও যদি স্টিকার না লাগায় তাহলে কী হবে?

বেশ কিছু ওষুধ কোম্পানিই তাদের ১ জুলাই-এর আগে তৈরি ওষুধের প্যাকেটে স্টিকার লাগিয়ে ২.৩% দাম বাড়ায়নি, কারণ সমস্ত ওষুধ বাজার থেকে ফেরত আনিয়ে তাতে স্টিকার লাগিয়ে ফের বাজারে ছাড়ার ঝক্কি অনেক। সেইসব ওষুধ আগের দামেই পাওয়া যাবে যতদিন না নতুন জিএসটি-পরবর্তী ব্যাচের ওষুধ বাজারে এসে পৌঁছোচ্ছে।

৭. কখন থেকে ওষুধের প্যাকেটে জিএসটি নির্ধারিত দাম দেখতে পাব?

১ জুলাই বা তার পরে তৈরি সমস্ত ওষুধের প্যাকেটে জিএসটি-পরবর্তী বর্ধিত মূল্য ছাপা হবে। অর্থাৎ আরও ৩-৪ মাসে জিএসটি-র আগের পুরোনো ওষুধের স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার পর সব ওষুধের দামেই জিএসটি-র বর্ধিত দাম ধরা থাকবে।

রোগী হচ্ছেন ওষুধের অন্তিম গ্রাহক। তাই ওষুধের ওপর বসানো সমস্ত কর রোগীই দেন।

এটা মনে রাখতে হবে, জিএসটি নেওয়া হয়, যতটা মূল্যের লেনদেন হয় তার উপরে, সেই জিনিসটার সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের ওপর না। সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের মধ্যে জিএসটি ধরা আছে। অর্থাৎ যে দোকানি MRP-র চেয়ে কম দামে ওষুধ বিক্রি করবেন তার দেয় জিএসটিও সেই হারে কম হবে।

৮. শেষ পর্যন্ত জিএসটি-র খরচ কাকে বহন করতে হচ্ছে?

রোগী হচ্ছেন ওষুধের অন্তিম গ্রাহক। তাই ওষুধের ওপর বসানো সমস্ত কর রোগীই দেন। আগেও এমনই ছিল। তবে জিএসটি আসার পর ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হয়েছে।

যেমন ধরা যাক, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করা আছে এমন একটি হাসপাতাল 'ক' কোম্পানির কাছে ১০০ টাকার একটি ওষুধ কিনল। ‘ক’ ওই হাসপাতালকে যে ক্যাশ মেমো দেবে তাতে ১০০ টাকা + ১২টাকা (১২% জিএসটি)= ১১২ টাকার উল্লেখ থাকবে। এই ১২ টাকা 'ক' কোম্পানি সরকারকে দেবে জিএসটি ফাইল করার সময়।

এবার ওই ওষুধের MRP যদি ১৪০ টাকা হয়ে থাকে, তাহলে রোগীকে হাসপাতাল যে ক্যাশ মেমো দেবে তাতে ১২৫ টাকা+১৫ টাকা (১২৫-এর ১২%) = ১৪০ টাকা লেখা থাকবে। এখানে হাসপাতাল ‘ক’-এর কাছে ওষুধটা কেনার সময় ১২ টাকা আগেই দিয়ে দিয়েছিল, তারা এবার জিএসটি ফাইল করার সময় শুধু ৩ টাকা দেবে। অর্থাৎ রোগীই শেষ পর্যন্ত জিএসটি দিচ্ছেন, ৩ টাকা হাসপাতালের মাধ্যমে, আর ১২ টাকা ওষুধ কোম্পানির মাধ্যমে।

৯. কোনো হাসপাতালের যদি জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করা না থাকে তাহলে কী হবে?

কোনো হাসপাতাল বা ওষুধের দোকানির জিএসটি রেজিস্ট্রেশন করা না থাকলে সেটি ভিন রাজ্যে তৈরি ওষুধ বিক্রি করতে পারবে না। তবে চাইলে ভিন রাজ্য থেকে কেনা ওষুধ বিনামূল্যে বিলিয়ে দিতে পারে।

১০. আচ্ছা, যদি ওষুধের পরিবর্তে ওষুধের মূল যে রাসায়নিক পদার্থ সেটি কেনা বা বেচা হয় সেক্ষেত্রে কী হিসেব চলবে?

ওষুধের মূল রাসায়নিক কেনাবেচার ক্ষেত্রে ১৮% জিএসটি ধার্য করা হয়েছে। যেখানে আগে ভ্যাট ও এক্সাইজ ট্যাক্স মিলে ১৭.৬% ট্যাক্স ছিল। অর্থাৎ দামের খুব একটা হেরফের হচ্ছে না। কিছু কিছু সক্রিয় রাসায়নিক ৫% ট্যাক্সের আওতায় রয়েছে। একাধিক রাসায়নিক নিয়ে তৈরি ফর্মুলেশন ওষুধের ওপর ট্যাক্স ৫% বা ১২% রয়েছে। আমি যদি ১০০ টাকায় 'খ' কোম্পানির কাছ থেকে রাসায়নিক কিনে কোনো ফর্মূলেশন ওষুধ বানিয়ে ২০০ টাকায় সেটা বিক্রি করি, তাহলে আমাকে মোট ২৪ টাকা(২০০ এর ২০%) জিএসটি দিতে হবে। এই ২৪ টাকার মধ্যে ১৮ টাকা দিতে হবে 'খ'-কে (মূল রাসায়নিকের ওপর ট্যাক্স ১৮%) আর বাকি ৬ টাকা দিতে হবে সরকারকে। শেষ বিচারে কিন্তু পুরো টাকাটাই আসছে রোগীর পকেট থেকে।

এই বিশাল ঝঞ্ঝাটের কর দেওয়ার পদ্ধতিগত ত্রুটি বেরোতে বাধ্য, তাতে করদাতা আর সরকারের মধ্যে আইনি ঝামেলাও বাড়বে।

অর্থাৎ, সরকারকে যতটা জিএসটি দিতে হচ্ছে তার পুরোটাই দিচ্ছেন রোগী। ওষুধ কোম্পানি, ডিলার, রিটেলার কেউই নিজের পকেট থেকে জিএসটি দিচ্ছেন না।

১১. তাহলে কি জিএসটি-র ফলে ওষুধের দাম কমল?

না। ৫% জিএসটির ওষুধের ক্ষেত্রে দাম একই আছে। ১২% জিএসটির ওষুধের দাম ২.৩% বেড়েছে।

১২. জিএসটি নাকি ভোক্তাকে আগের চেয়ে বেশি সুবিধা দেবে, সেই আশ্বাসের কী হল?

আদপেই এরকম কিছু হয়নি। দাম তো বেড়েইছে। উপরন্তু ট্যাক্স জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক বেশি ঝঞ্ঝাটের হয়ে উঠল। আগে যেখানে মাসে মাসে ট্যাক্স দেওয়ার কোনো নিয়ম ছিল না, এখন সেখানে প্রত্যেক মাসে উৎপাদক, ডিলার, দোকানি সকলকে ট্যাক্স অনলাইনে জমা দিতে হবে। ছোটো ব্যবসা যাদের তাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা খুবই অসুবিধাজনক।

১৩. তাহলে জিএসটি-র ফলে লাভবান হলেন কারা?

কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার তো লাভবান হলই। কারণ তাদের কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ল। এবার সেই টাকা জনগণের কোন সেবায় লাগবে তা সরকারই জানেন। আর যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে, এই বিশাল ঝঞ্ঝাটের কর দেওয়ার পদ্ধতিগত ত্রুটি বেরোতে বাধ্য, তাতে করদাতা আর সরকারের মধ্যে আইনি ঝামেলাও বাড়বে। আদালতে অনেক বেশি বেশি ট্যাক্স ঘটিত 'কেস' বাড়বে। মানে Chartered Accountant আর উকিলদের পোয়াবারো হবে আর কি! আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণের কিছুটা সুবিধা হয়তো হবে। তবে শেষ পর্যন্ত এই বিশাল পরিবর্তনের ধাক্কা আমাদের কোনদিকে যাবে সেটা আরও কিছুদিন, অন্তত বছরখানেক না গেলে পুরোটা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।

১৪. জিএসটি-র ফলে কি দুর্নীতির অবসান হবে?

হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য আমাদের কথা মিথ্যে প্রমাণিত হোক, সেটাই আমরা চাই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখকদ্বয় এস. শ্রীনিবাসন ও টি. শ্রীকৃষ্ণ LOCOST নামে বদোদরার একটি জেনেরিক ওষুধ তৈরির কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। অনুবাদক ডা. অপূর্ব এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকে আংশিক সময়ের চিকিৎসক|

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

দশম পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

'ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে' পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেওখুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এবার আমার বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি মিলল। মামা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে মামাকে অন্তত দশবার জিগেস করেছি: 'বাবা কেমন আছেন?' বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে মামা বলেছেন: 'ভালো আছেন।' বাপের বাড়ি ফিরছিলাম বেশ খুশি মনে। নৌকো ঘাটে লাগল। আমার জন্যে পালকি এল, তাতে চড়ে বসলাম। বারমহলে রীত মেনে বাজনা বেজে উঠল; পালকি গিয়ে নামল অন্দরমহলের আঙিনায়। পালকি থেকে নেমে আমি অন্দরমহলের দিকে গেলাম। মা দোরগোড়াতেই বসেছিলেন; তাঁর পরণে একটা পুরোনো চিকন লালপেড়ে ধুতি। এখন আর আমার বুঝতে কিছু বাকি রইল না। প্রণাম করতে পা ছুঁতে গিয়ে তাঁর খালি হাত দেখে আমি আর সামলাতে পারলাম না। দমকে দমকে আর্ত-কান্না উঠে আসতে লাগল; বেসামাল হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। ঠাকুমা এসে কাঁদতে লাগলেন। মা-ও ফোঁপাতে শুরু করে দিলেন। আমার ভেতরটা যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। বাবার জন্যে আমি কুটোটিও নাড়তে পারিনি; একথা যত ভাবছিলাম ততই ভেতরটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। মৃত্যুর আগে বাবাকে একটি বারের জন্যে দেখতে পাইনি এ শোক আমার আজও যায়নি। বাবার মতো বন্ধু পরম হিতৈষী আমার দুঃখের সহমর্মী দ্বিতীয়টি তো আর কেউ নেই। ও বাবা! তুমি আমায় ফেলে রেখে কেন চলে গেলে? তোমার অন্তিম মুহূর্তে আমি তোমার পাশে থাকতে পারিনি এ যন্ত্রণা আমি ভুলি কী করে। এখন আমি প্রয়াত বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্যে মেয়ের ক্রিয়াকর্তব্য পালন শুরু করলাম। শাশুড়িকে চিঠি লিখলাম, তিনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমি অশৌচের সময় এবং পরের অমাবস্যায় রীত মেনে নিজের হাতে ভাত ফুটিয়ে খেলাম। মায়ের কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল তার থেকে একশো টাকা নিলাম। শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে আমি বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলাম। এই ক্রিয়াকর্মাদি পালনে আমার একশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়েছিল।

মা আমাকে জানালেন, বাবা আমার জন্যে পঞ্চাশ বিঘা জমি, কালীবাবুর ভিটেবাড়ি আর জমিজিরেত রেখে গেছেন, সঙ্গে পারিবারিক আয় থেকে দশ টাকা মাসোহারাও বরাদ্দ করে গেছেন। তিনি বললেন: 'দেনা শোধের জন্যে আমি ওগুলো সব ইজারা দিয়েছি; কিছুদিন সময় লাগবে ওগুলো ফেরত পেতে। তখন তুমি তোমার বিষয়-আশয় বুঝে নিও।' এ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার তো আর অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। কিছুদিন আমি সেখানে থেকে গেলাম। মায়ের কাছে জানতে পারলাম আমার গচ্ছিত ২০০০ টাকা ধার দিয়ে সুদ হয়েছে ৭০০ টাকা। মানে এখন আমার

আছে ২৭০০ টাকা। কিন্তু মা এখন যা আতান্তরে পড়েছেন, তা দেখে কষ্টে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। অনেক বদলে গেছেন তিনি। তাঁর দুমদাম রেগে-ওঠা, খিটখিটে মেজাজ সব কোথায় উধাও। চিন্তায় চিন্তায় তাঁর চেহারাটা হয়ে উঠেছে প্যাঁকাটির মতো। মা যে এতটাই বদলে গিয়েছেন এটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না, ভেতরটা কেমন গুমরে গুমরে উঠছিল। মা-ঠাকমা তখন একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। বড়-ঠাকমা এরমধ্যে মারা গিয়েছেন। আমি ওঁদের রেঁধে দিতাম। ভাইয়ের বউ পরিবারের অন্যদের জন্যে আমিষ রাঁধতেন। মা আমাদের বিষয়-আশয় আর জমিদারি কী সুরাহা হবে, তা নিয়ে ম্যানেজার ও দালালদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত। তিনি আর মামা সর্বক্ষণ এই কাজেই ডুবে থাকতেন। ভাইয়ের বউ আর আমি মিলে সামলাতাম ঘরকন্নার কাজ। জমিদারির বিষয়গুলো মা এমনভাবে বন্দোবস্ত করলেন যাতে আমার ছোটো ভাই যখন সাবালক হয়ে উঠবে তার মধ্যে আমাদের সব দেনা শোধ হয়ে যাবে ও আমাদের সমস্ত বন্ধকি সম্পত্তিকেও ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে। তখন আমাদের নদীর ধারে পলি-জমা জমিতে (খুব উর্বরা জমি) যে ধান ফলে আর গ্রামগঞ্জ থেকে যে খাজনা আসবে তা দিয়ে আমাদের পরিবারের খরচ-খরচা অনায়াসেই মিটে যাবে। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। মাথা খাটিয়ে এমন একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন বলে সকলেই মাকে সাধুবাদ দিলেন।

আমার বড়ো ভাইটি দিন দিন একটা ত্রিপণ্ড হয়ে উঠছিল। ওই সময়ে ও রেলওয়ে-নির্মাণের সঙ্গে জড়ানো একটা কাজ করত। যে ইংরেজটির ওপর এসব কাজের দেখাশোনার ভার ছিল, তিনি ওর প্রতি খুব সদয় ছিলেন, মাসে ৬০ টাকা করে মাইনে দিতেন। ওই টাকায় ওর কুলোত না। ও আবার মায়ের আদরের ধন। বাড়ি থেকেও মাসে মাসে টাকা নিত। অমিতাচারের এমন ঢালাও বন্দোবস্ত থাকায় ও একটা উচ্ছৃংখল মোদো-মাতাল হয়ে উঠছিল।

কিছুদিন বাদে খবর পেলাম শাশুড়ির অসুখ। তিনি আমাকে আনতে লোক পাঠালেন। একই সময় ঠাকমারও অসুখ—পুরোনো আমাশা। কিন্তু কেউই তাঁর রোগবালাই নিয়ে তেমন একটা গা করে না। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে দেখলাম শাশুড়ির অবস্থা বেশ সঙিন। মেজদি এর মধ্যেই ফিরে এসেছেন এবং ওঁর সেবাশুশ্রূষায় লেগে পড়েছেন। ফিরে এসেই আমি ওঁর সেবাশুশ্রূষার ভার নিয়ে নিলাম। বড়ো ভাশুর ছুটিতে বাড়ি ফিরে এসেছেন, সঙ্গে তাঁর কচি বউ। কচি বড়ো-জা আবার তাঁর কচিকাঁচাদের সামলাতেই সারাদিন ব্যস্ত। মায়ের গোটা শরীর ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে; জলের মতন পাতলা পায়খানা, সবথেকে বড়ো ফ্যাসাদ, যা যা তার খেতে মানা সেগুলোই খাচ্ছেন বেশি বেশি করে। সেজন্যে তাঁর ভালো হয়ে ওঠার লক্ষণ তো নেই-ই, বরং দিন দিন অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। এরই মাঝে ঠাকমা মারা গেলেন। খবরটা আমি পেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু বাপের বাড়ি গিয়ে উঠতে পারিনি। কেননা তখন শাশুড়ি অসুস্থ। কয়েকদিন বাদে প্রায় ঘোষণা করার মতো করে জানালেন, তাঁর মাছের মুড়ো খেতে সাধ জেগেছে। বিধবাদের ওপর যেসব সামাজিক বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিধবা-জীবন জুড়ে তিনি সেগুলো সব কঠোরভাবে মেনে এসেছেন। নিষ্ঠাবতী একাহারী বিধবা দিনে একবার ঘি দিয়ে পাক করা নিরামিষ ও অন্ন গ্রহণ করতেন। বছরের অর্ধেকটা তাঁর উপোস দিয়েই কেটে যেত। তাঁর এই উৎকট ইচ্ছের কথা শুনে সকলেই কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। কী করা যায়? সকলে মিলে সলাপরামর্শ চলল: ওঁর সাধ কি পূরণ করা হবে, না কি হবে না? কেউ বললেন, হ্যাঁ, কেউ আবার, না। কী করা হবে সকলে মিলে কেউ কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তখন বড়ো ভাশুর বললেন: ‘মা যা-ই- চান না কেন, তা-ই আমি ওঁকে দেব। তোমাদের বলে দিচ্ছি, যা চাইছেন ওঁকে দাও। এতে যদি কোনো পাপ হয়, সে-পাপ আমার।’ সেদিনই পুকুর থেকে একটা বড়ো মাছ ধরে তার মুড়োটা ওঁকে খেতে দেওয়া হল। তারপর থেকে যে-কটা দিন উনি বেঁচেছিলেন রোজই ওঁকে মাছ দেওয়া হত। আমি তো আগে থেকেই আমিষ খাই, শাশুড়ির এই শেষ ইচ্ছে থেকে আরও ভালো করে বুঝতে পারলাম নিজের ওপর জোর করে কোনো বিধিনিষেধ চাপিয়ে না দেওয়াই ভালো।

কিছুদিনের মধ্যেই শাশুড়ি এ-জগৎ ছেড়ে চলে গেলেন। হায় রে, তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র ভরসার জায়গা, এখন তা-ও চলে গেল। ওইদিন থেকে সত্যি সত্যি নিঃসহায় নির্বান্ধব হয়ে পড়লাম। তখন আমি বাবা চলে যাওয়ার শোকে মুহ্যমান; আর এখন শাশুড়িও চলে গেলেন। টের পেলাম, ভেতরটা সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আমাকে নিয়ে ভাববেন, আমার জন্য দুঃশ্চিন্তায় আকুল হবেন; এমন কেউ আর আমার রইল না। মাস খানেকের মধ্যে শ্রাদ্ধশান্তি সব চুকে গেল। আমি মেজদি (মেজো জা)-র সঙ্গে রাজমহলে তাঁর বাড়ি গেলাম। বহু বছর আগে ওইখানে বাবার জমিদারির কিছু জমিজমা ছিল।

মেজদি আমার খুব যত্ন-আত্তি করতেন। হেঁশেলের রান্নার ভারটা আমিই নিয়ে নিলাম। শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর মেজদি বিধবারা যেসব বিধিনষেধ পালন করেন সেগুলো ভাঙার আর সাহস পেতেন না। আমাকে নিরামিষই খেতে দিতেন। তবে তিনি যা দিতেন তাতেই আমার পেট ভরে যেত।

কিছুকাল পরে ওঁরা পাঁচির বিয়ে দিলেন, কিন্তু আমি সেখানে থাকতে পারিনি। কেননা বড়োভাশুর এদিকে বুঁচির বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন কৃষ্ণনগরে। আমরা সব সেখানেই গিয়েছিলাম। খুব ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। বুঁচি গয়নাগাটি ভালোই পেল। আমার মনে হয়েছিল বড়ো ভাশুর নিজেই এতসব খরচাপাতি করছেন; কিন্তু তা নয়, খরচ হচ্ছিল আমার স্বামীর জমানো টাকা থেকে। ওঁরা মোক্তারনামা পাওয়ার জন্যে আমার থেকে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। ওঁরা আমার অভিভাবক, সেজন্যে আমাকে না-জানিয়ে যা খুশি তাই করতে পারতেন। কেউ বাধা দেওয়ার ছিল না। আইনের দিক থেকে বিধবা হিসেবে স্বামীর সম্পত্তিতে আমার অধিকার আছে একথা ঠিক, কিন্তু আসল বেলায় ভাত-কাপড়ের জন্যে ওঁদের মুখপানে-চেয়ে থাকা দাসী বই তো নই।

কে আমার অধিকার নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে? ওঁদের জমিদারির নায়েব মজুমদার মশাই ওঁদেরই জ্যাঠতুতো দাদা। তাঁকে ওঁরা সবাই মান্যি করেন। অন্য কাউকে দিয়ে আমি যদি ওঁকে কোনো প্রশ্ন শুধোতে চাই, তবে তো তিনি সকলকে শুনিয়ে চিৎকার করতে থাকবেন: 'ওসব খবরে তোমার দরকারটা কি শুনি? তোমাকে খেতে দিই না? পরতে

জীবনে কিছু অধিকার কিছু হক মানুষ পেতে চায়, এসব না পেলে তারা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে না। যেখানে থাকতাম সেখানে না-ছিল আমার বেঁচে থাকার ফুর্তি, না-ছিল কোনো নিরাপত্তাবোধ।

দিই না? মাথা গোঁজার একটা ঠাঁইও জুটেছে না কি?'

কৃষ্ণনগর থেকে বাড়ি ফিরে এলাম। আশু মিত্র ঘ্যানঘ্যান করত আর কতরকম যে তার কেচ্ছা। গা জ্বালা করত আমার কিন্তু কীই-বা করব? সয়ে নিতাম। আমি রোজই পুবদিকের বাড়িটার দোতলায় উঠে পড়তে বসতাম। আগে থেকেই লেখা বেশকিছু খাতা জোগাড় করেছিলাম, তার ওপর হাতের লেখা মকশো করতাম।

জীবনে কিছু অধিকার কিছু হক মানুষ পেতে চায়, এসব না পেলে তারা নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে না। যেখানে থাকতাম সেখানে না-ছিল আমার বেঁচে থাকার ফুর্তি, না-ছিল কোনো নিরাপত্তাবোধ। আমি ফের কৃষ্ণনগরে গেলাম। ওখানে অন্তত আমার পছন্দের দু-চারজন মানুষ আছেন। আগের বার আমি ওখানে হেঁশেলের ভার নিয়েছিলাম। এবার এসে দেখলাম মাগুরায় যে মেয়েটি রাঁধুনি ছিল তাকেই এখানে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে। হেমাঙ্গিনী, একেবারেই কচি একটা মেয়ে, এতগুলো লোকের হেঁশেল কি একা হাতে ঠেলতে পারে? আট-দশজন ছাত্র আর কাজের খোঁজে আসা দু-চারজন ও-বাড়িতে থাকত। তার ওপর ঝি-চাকর, বাড়ির কর্তা, তার বউ আর আমার দুই সৎ মেয়ে। এরা সব তো ছিলই তার ওপর আবার এসে পড়লাম আমি।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না। পড়শিদের কোনো মেয়ে বা ছেলে যদি ডাকত তাহলেই টুকটাক কিছু কথা চালাচালি করতে পারতাম। আমাদের ঠিক পাশের বাড়ির পড়শি ছিলেন একজন মুনসেফ। ওঁরা খেরেস্তান। ওঁদের ফুটফুটে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ওঁদের বাড়ির ঝি আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসত। সে আমাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে রোজই গল্পগুজব চালাত আর বলত: 'আমার গিন্নিমা একদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।' হেমাঙ্গিনী আর আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম: 'ওদের যখন খুশি আসতে বোলো।' একদিন বিকেলে ওঁরা এলেন। আমরা দু-জনেই একটু কাঁচা আর হাঁ-করা ধরনের ছিলাম। তবে আমাদের সাধ্যমতো যতটা সৌজন্য দেখানো যায় দেখালাম। বড়দি আর আমি দু-জনে এক টাকা করে দিয়ে কিছু ভাজাভুজি আনিয়ে ওঁদের আপ্যায়ন করলাম। আমরা তো ওঁদের নেমন্তন্ন করে ডেকে আনিনি, তাই ভেবেছিলাম এর বেশি কিছু না-করলেও চলে। কিন্তু ওঁদের ঘোড়াগাড়ি সময়মতো আসল না। ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন। বাচ্চাগুলো ঘুমে ঢুলে পরছিল। একবার বড়দিকে বললাম: 'ওদের একেবারে খাইয়ে দিলেই তো ভালো।' তিনি জবাব দিলেন: 'না বাবা, ও আমি পারব না, কেননা বাড়ি ফিরে সব শুনেটুনে আমার কর্তাটির মেজাজ-মরজি কী হবে তা তো আর জানি না।'* আমি আর কথা বাড়ালাম না, কীই-বা বলতাম আমি? জোর করব যে তেমন মুরোদই বা কই? ওঁরা হেঁটে বাড়ি ফিরে গেলেন রাত এগারোটায়।

পরদিন ওঁরা আমার বড়ো ভাশুরকে জানালেন, সে-রাতে ওঁদের না-খেয়ে থাকতে হয়েছিল আরও কী কী সব বলেছিলেন আমি জানি না। রেগে আগুন হয়ে বাড়ি ফিরে এসেই তিনি জানতে চাইলেন: 'ওঁদের কিছু খেতে দেওয়া হয়নি কেন?'

এ-সংসারে আমার কতটুকু অধিকার আছে-না-আছে, তা নিয়ে দু-একটা কথা বলে নিতে চাইছি। আমার এমনকী নিজের ভাতটা বেড়ে নেওয়ার জো ছিল না। যতক্ষণ না আমার জা আমাকে ভাত বেড়ে দিতেন ততক্ষণ না-খেয়ে থাকতে হত। রোজ বাড়িতে আম আসত, বাড়ির লোকজনরা বিকেলে সে আম খেত। দুটো ঝুড়িতে দু-রকম আম আসত—একটা বাড়ির কর্তা- গিন্নিদের জন্যে, আর একটা চাকর-বাকরদের জন্যে। আমিও রোজ কয়েকটা করে আম পেতাম ঠিকই, তবে তা ওই চাকর-বাকরদের ঝুড়ির আম। এই তো আমার হাল। সংসারে কোনটা কী হবে, কী হবে না—এসব ঠিক করার আমি কে? রাঁধুনি অন্নদা গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলতে শুরু করল: 'নুন খেয়েছি তোমার, হক কথা আমি বলবই। যত নষ্টের গোড়া তোমার ওই ছোটো ভাইয়ের বিধবাটা। যে বউটি এসেছিল, ও তো একটা কচি বাচ্চা। ও কি কিছু বোঝে? তোমার ওই ছোটো ভাইয়ের বিধবাটা নিশ্চয়ই মনে মনে মতলব আঁটছে যে খেরেস্তান হয়ে যাবে; আর সে জন্যেই ওদের সঙ্গে এত ঢলাঢলি গলাগলি। বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছে।' শোনা মাত্র ভাশুর আমায় যাচ্ছেতাইভাবে গালিগালাজ দেওয়া শুরু করলেন। তাঁর গা-চিড়বিড়ানি ভাষার কী যে জ্বলুনি তা আর কহতব্য নয়। বললেন: 'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। এখানে তোর কোনো স্থান নেই।' এত অপমান! তবুও সবকিছু আমি নীরবে সয়ে গেলাম। কেবল ঈশ্বরের কাছে আমার মনে যত দুঃখকষ্ট-যন্ত্রণা সব উজাড় করে দিয়ে বললাম: 'হে ভগবান! আমার সব কথা তুমি তো জান। কী এমন দোষ আমি করেছি যে আমাকে এত অপমান সইতে হবে?' আমার মনে এক গভীর বিষাদ ঘনিয়ে এল। আমাকে বলা হল রাজমহলে চলে যেতে, আর সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাজমহলে গিয়ে দেখলাম মেজদির বাচ্চা হতে আর দেরি নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর একটা বাচ্চা হল। যতটা পারি সে বাচ্চার দেখভাল করতাম আমি। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। হঠাৎ একদিন স্বপ্ন

দেখলাম—মা আর কাকিমাকে খাটিয়ায় বসিয়ে কয়েকটা লোক কাঁধে করে কোথায় যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওঁরা বললেন: 'আমরা চলে যাচ্ছি। এতদূর এসেছি শুধু তোকে কথাটা জানাতে।' জেগে উঠে আমি 'মা মা' বলে কাঁদতে শুরু করলাম। মরার আগে মা-কে শেষ দেখাটা দেখতে পেলাম না—আমার ভেতরটা কুরে কুরে ক্ষইয়ে দিচ্ছিল। আমার যা-কিছু সবই তো মায়ের জিম্মায়। এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিলাম এমন সময় কানে এল—'টেলিগ্রাফ'। আমার মেজোভাশুর বেরিয়ে গেলেন, মেজদিও তাঁর পিছু পিছু। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার আড়ালে।

খবর পেলাম মা, কাকিমা দুজনেই মারা গেছেন তিন দিন আগে পিছে। ভাই আমায় আগে খবরটা দেয়নি পাছে আমি মায়ের হেফাজতে রাখা আমার টাকা চেয়ে বসি। মায়ের কোথায় কী আছে না আছে এসব দরকারি খুঁটিনাটি জেনে নেওয়া সাড়া হলে আর ছোটো ছোটো ভাই বোন দুটি দেখভাল করার একটা হিল্লে হয়ে যাওয়ার পরই আমাকে তার পাঠায়। মরণকালে মা কোনো নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেননি। মায়ের এক ভাগনে মায়ের হয়ে হুন্ডিতে সুদে টাকা খাটাত। ঋণের মেয়াদ শেষ হলে টাকা আদায় করত। মা তো কোনো নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেননি। ফলে দীনদয়াল মিত্রকে আর পায় কে! ফুর্তির চোটে চার পাক নেচে নিয়েছিল নিশ্চয়ই। এখন মা তো আর নেই আমি কাকে কী বলব—ওই টাকাগুলো তো আমারই, মায়ের হেফাজতে রাখা ছিল।

মা আমাকে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেলেন। এখন আমি কপর্দকশূন্য। ভাই কিছু পেয়েছিল কিনা জানি না, আমি এক কানাকড়িও পাইনি। এহেন দশায় আমি আর কী করতে পারতাম? কাকাকে জানালাম সব কথা। তিনি কয়েকজন দেনাদারকে পাকড়াও করে তাদের ধমকধামক দিয়ে ২০০ টাকা মতো আদায় করে দিতে পারলেন। মায়ের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে আমি তার থেকে কিছুটা খরচ করলাম। আমার বাবার মৃত্যুর সময়ে শাশুড়ি আমায় কিছু টাকা দিয়েছিলেন। এখন তিনি গত, আমি কার কাছে আর হাত পাতব? টাকা দেওয়ার মতো আমার আর কেউই রইল না। মায়ের কাছে জমা রাখা আমার টাকা সুদে-আসলে বেড়ে প্রায় ৩০০০ টাকার মতো হয়েছিল। কিন্তু সে টাকা আদায় করার কোনো উপায় তো আর নেই। আমি মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে প্রজাদের নেমন্তন্ন করেছিলাম। তাদের কাছে আমার এখনকার সঙিন অবস্থার সব কথা খুলে বললাম। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের পর তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ৭০০ টাকার মতো চাঁদা তুলে ফেলল আর সেই টাকা আমার হাতে তুলে দিল।

এখন আমি সত্যি সত্যি দুঃখের সাগরে ভাসতে লাগলাম। মা একটি আঠেরো মাসের দুধের শিশুকে (মেয়ে) রেখে গেছেন। সঙ্গে আমার আট বছরের একটি ভাইও ছিল। কাকা যোগেন ঘোষের পাঁচটি মা-মরা ছেলেমেয়ে। সবথেকে ছোটোটা মঙ্গলের বয়স মাত্র এক বছর। ওদের মাসি ওদের দেখাশোনার ভার নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি সংসারে যত গোল পাকানোর মূলে। তাঁর সঙ্গে কাকার অনেকদিন ধরেই আশনাই চলছিল। তিনি শুধু মঙ্গলকেই যত্নআত্তি করতেন; আর চারটি পেটে কিল মেরে রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরির মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত।

কোনো কোনো দিন সকালে আমি এক হাঁড়ি ফেনাভাত ওদের রেঁধে দিতাম। গোটা দিনে ওটাই ছিল ওদের একমাত্র খাবার, আর কিছু জুটত না। আমি চান করিয়ে দিলেই ওদের চান করা হত, নয়তো নয়। ওদেরকে ওদের মাসি বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে দিত না; ঝেঁটিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। কাকা ফিরে আসলে ওদের নামে ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ করত। ফলে ওরা ফের পিটুনি খেত। সেজন্যে ভয়ে ভয়ে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকত। কখনো কোনো ফাঁকে এসে আমার সঙ্গে চান করে, খেয়ে ফের লুকিয়ে পড়ত। রাতে ছেলেগুলো শুয়ে পড়ত একটা বুড়ো চাকরের পাশে আর মেয়েটা আমার সঙ্গে।

আমার ভাইয়ের বাড়াবাড়ি ফুলেফেঁপে দশগুণ হয়ে উঠল। মদের স্রোত বইতে লাগল। নাচা-গানা-নাটকের মজলিশের কোনো কমতি রইল না। রাজ্যের যত বদ লোকের সঙ্গেই ওর দহরম-মহরম। এসব দেখেশুনে কাকা যোগেন ঘোষ প্রজাদের গোপনে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললেন খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিতে। আমাদের আর দিন চলে না, নিত্যনৈমিত্তিক খরচ জোটাব কোথা থেকে? গোলায় যা ধান মজুত ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। খেত থেকে নতুন তোলা ধান এক দানাও আর জমা পড়েনি। খাবটা কী এখন? ভাই আমার গয়নাগাটি সব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিল। ভাইয়ের বউ তার নিজের গয়নাগাটি নিয়ে চলে গেল বাপের বাড়ি। আমরা তিনজন—আমার ছোট্ট ভাই আর আমরা দু-বোন—পড়লাম অকূল পাথারে। মামাকে চিঠি লিখলাম আসতে। তিনি এলেন, বললেন: 'যোগেন ঘোষের সঙ্গে মামলা করে জেতা যায় নাকি? ওসব আমার দ্বারা হবে না।' আমার এই বিপদের সময় তিনি আমার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারলেন। অথচ এই মামা মায়ের সৎ ভাই, আর তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা আমাদের বাড়িতে, বাবার আশ্রয়ে।

শেষমেশ আমি ঠিক করলাম বোনকে নিয়ে চলে যাব শ্বশুরবাড়িতে আর ভাইকে রেখে যাব পূর্ণ শিকদারের বাড়িতে। পূর্ণ শিকদার বাবার পুরোনো খাস চাকরের ছেলে। অমন দয়ার শরীর সারা গাঁ ঢুঁড়ে বেড়ালেও আর একটা মিলবে বলে মনে হয় না। ওরা জাতে কায়স্থ তবে ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে চাকরের পর্যায়ে চলে গেছে। পূর্ণ শিকদার হয়ে উঠলেন আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের রুটি-রুজির জোগানদার। আমার কাকার মা-হারা ছেলেমেয়েগুলোর হালও আমাদেরই মতো, কেননা তাদের মাসির নিজের দিকে ছাড়া আর কারও দিকে নজর দেওয়ার ফুরসত মেলেনি। মায়ের এক পিসতুতো ভাই ছিলেন, কলকাতায় থাকতেন। ওঁর কাছে গেলাম—আমার ছোটো ছোটো ভাইবোন দুটির যদি কিছু একটা হিল্লে হয় এই আশায় আশায়। পোড়া কপাল আমার! সবাই তো দেখি যোগেন্দ্র ঘোষের ভয়ে থরহরিকম্পমান। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

আসুন সত্যিকারের স্বাধীন হই

রুমঝুম ভট্টাচার্য

অদ্ভুত একটা স্বপ্নে ঘুমটা ভেঙে গেল। দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে চপ্ চপ্ করছে। ঘড়িতে এখন রাত আড়াইটে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে মিত্রা। দরজায় কি কেউ নক্ করছে? ভীষণ এক আতঙ্কে ভুগছে গত সপ্তাহ থেকে। যেকোনো সময় যা কিছু হতে পারে। মিত্রা সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত। দিল্লিতে একটা ফ্ল্যাটে একা থাকে। কিছুদিন যাবৎ রাজনৈতিক একটা ইস্যু নিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে সে। তাই গত সপ্তাহ থেকে চলছে হুমকির পালা। কিছু মেসেজ, ফোনকল . . . আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই কথা--এ বিষয়টা লেখা ছাড়তে হবে, না হলে তাকে যেকোনো সময়েই রেপ্ করে দেওয়া হবে। চরম শাস্তি!

এ তো গেল এক মেয়ে সাংবাদিকের পেশা সংক্রান্ত ঝঞ্ঝাট। একজন শিক্ষিত মেয়েকে অবদমিত করার গল্প। প্রশ্ন জাগে মনে, মিত্রা কি সেই 'খারাপ' মেয়েদের মতো? যারা হট্‌প্যান্ট পরে, পার্ক-এ যায়, ঘর-সংসারের কাজ না করে বাইরের কাজে যুক্ত, হয়তো-বা নাইট ডিউটিতে যায়। না, এক্ষেত্রে মিত্রা-র অপরাধ ভিন্ন। কিন্তু অপরাধ যাই হোক, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শাস্তি একটাই 'ধর্ষণ'। মেয়েদের প্রতি হিংসা প্রকাশের এই বহুল প্রচলিত ধর্ষণ নিয়েই এবারের লেখা -

ধর্ষণ নিয়ে লিখতে বসেছি কিন্তু আমার লেখনী আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। সে আজ জেহাদ ঘোষণা করে বসে আছে। তার গণতান্ত্রিক অধিকার চাই। আমি যত বোঝাই তেমনটা হতে নেই, ওতে বিপদ বাড়ে। নাম কা ওয়াস্তে গণতান্ত্রিক আমার যা খুশি তাই লিখতে পারব না। ওতে মন্ত্রী-শান্ত্রীদের গোঁসা হতে পারে। বাক্‌স্বাধীনতা একটা সাজানো পরিভাষা। ভারতবর্ষ সত্তর বছরের স্বাধীনতা ভোগ করছে। নতুন করে তার পালে জাতীয়তাবাদের হাওয়া লেগেছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের নামে তাই মহিলাদের শালীনতা-র পাঠ নিতে হবে। না হলে পুরুষমানুষের পূর্ণ অধিকার আছে নারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধর্ষণ করার। তার পৌরুষ এটুকু দাবি করতেই পারে। ওই দেখুন অবাধ্য লেখনীর আস্পর্দা। সে আজ অপ্রিয় সত্যগুলির চুলচেরা বিচার না করে থামতেই চাইছে না। অগত্যা লেখনীর ইচ্ছার কাছে হার মেনে নিলাম। দেখাই যাক্ না কি লেখে সে। 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-এর সম্পাদকমণ্ডলী বিচার করুন এ লেখা ছাপার যোগ্য কিনা।

যেকোনো সামাজিক সমস্যা বুঝতে গেলে এবং সমস্যাটির সমাধান করতে চাইলে অবশ্যই সমস্যাটি কী কারণে তৈরি হচ্ছে সেটা জানা দরকার। ধর্ষণের কারণ বিচার করতে গিয়ে সমাজবিদরা দুটো দিক বিচার করে থাকেন সচরাচর।

১. ধর্ষকের আচরণের বিশেষত্ব

২. কিছু নারীর ক্ষেত্রে অপরাধ বেশি প্রযোজিত হওয়ার সম্ভাবনা।

ধর্ষণ ঠিক কী কারণে হয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কোনো একক তত্ত্ব বা উপাদান বিশ্লেষণ যথেষ্ট নয়। সমাজবিদ ও মনোবিদরা এই হিংসাত্মক আচরণের একাধিক কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। একটা প্রশ্ন, 'কেন এই মানুষটিই ধর্ষণের মতো হিংসাত্মক আচরণ করল? - হয়তো প্রত্যেকবার আমাদের নতুন নতুন কারণের মুখোমুখি দাঁড় করাবে। কত কত ব্যাখ্যা - হরমোন জনিত কারণ, মানসিক বিকৃতি, সামাজিককরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব, সামাজিক গঠনের প্রভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ধর্ষণ নামক হিংসা রুখতে সেই জন্যই কি মেয়েদের ওপর এমন বিধান জারি করা হয় যে, এতরকম কারণ এই অপরাধের জন্ম দেয় যে এই অপরাধ রুখতে অপরাধীকে কোনো নির্দেশের বাঁধনে আটকানো মুশকিল, তাই নারী তোমরা সাবধান হও, ছোটো পোশাক-টোশাক পরো না। রাতের বেলা কাজ থেকে ফিরো না, বেশি বাড়ি থেকে বেরিও না তাহলে সমাজ কোন দায়িত্ব নিতে পারবে না।

ব্যক্তিবিশেষের বৈশিষ্ট্য যেমন--ব্যক্তিত্ব, মানসিক গঠন, পারিবারিক পরিমণ্ডল, তার শিশুবেলার অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এইসব ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিকতা হারায় যখন গণধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে। একই রকম ব্যাক্তিত্বের, একই হরমোনঘটিত অসুখে আক্রান্ত, একই রকম বিকৃত মানসিকতার, একই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চারটে কি পাঁচটা মানুষ একই সময় একত্রিত হয়ে একটি নারীকে ধর্ষণে উদ্যত হয়? বার বার এও কি সম্ভব না বিশ্বাসযোগ্য?

অর্থাৎ 'ধর্ষণ' নামক অপরাধের এই সব আনুষাঙ্গিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণগুলিই অনেকাংশে দায়ী। তাঁর মধ্যে প্রধান হল—লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination)। এই সমাজ লিঙ্গ নির্মাণ করে যত্ন সহকারে। পুরুষমানুষের আচার-আচরণ, ভূমিকা, পোশাক-

আশাক, চলাফেরায় যথেষ্ট স্বাধীনতা নির্মাণ করা আছে। তুলনায় নারীদের সে স্বাধীনতা কম। কে ঠিক করবার মালিক? নারী কী পরবে, কোথায় যাবে, কী কাজ করবে? সমাজের মুখপাত্র সে তো একজন পুরুষ। আর এই লিঙ্গ নির্মাণের গোড়ার কথা হল ক্ষমতা। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতার থেকেই এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সংকোচনের ইচ্ছা। 'দমন' নীতির ফলশ্রুতি 'ধর্ষণ' নামক হিংসা।

আর যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রত্যক্ষণ (Perception), চিন্তন (Thought) ও বিশ্বাসের (Belief) বিকৃতি (Distortion), যাকে মনোবিদ্যার ভাষায় বলা যায় 'Cognitive Distortion'। দেখে নেওয়া যাক্ , সেটা কীভাবে ধর্ষণের মতো যৌন অপরাধের কারণ হিসাবে কাজ করে। যদি ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ, চিন্তন ও বিশ্বাসে যুক্তির অভাব ঘটে তখন ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতিগুলি প্রভাবিত হয় এবং ব্যক্তি সেই অসংযত আবেগ অনুযায়ী আচরণ করে। পুরুষদের মনে নারীর সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস, ধারণা গেঁথে থাকলে সে ধর্ষণের কারণ হিসাবে অনেক যুক্তি খাড়া করে। এমন কিছু সাধারণ ধারণা যা ধর্ষণ নামক অপরাধকে যৌক্তিকতার ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে, নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

যেমন - দুর্জ্ঞেয়, এবং নারী আসলে ছলনাময়ী। যে মেয়েটি হট্প্যান্ট পরেছে, যার শরীর খোলামেলা পোশাকের দরুন অনেকটা দেখা যায়, সে আসলে যৌন সংসর্গ চাইছে কিন্তু বলতে পারছে না। আমি পুরুষ, আমার অধিকার আছে এমন একটা মেয়েকে যৌনমিলনের প্রস্তাব দেওয়ার। যদি সে না বলে তাঁর মানে আসলে সে হ্যাঁ বলতে পারছে না লজ্জায়। তাই ধর্ষণ চলতে পারে।

দেখুন ধর্ষকের বিশ্বাস ও ধারণাগুলি কতটা নিজস্ব বিচারধারায় জর্জরিত (Judgemental)।

নারী সম্ভোগের বস্তু। তারা পুরুষমানুষের ভোগ্য পণ্য। নারী তার নিজস্ব চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তাই তার মুখের প্রতিবাদ শুনলে চলবে না। তাকে জোর করতে হবে। যেমন--কোনো অশালীন মন্তব্য করার পর মেয়েটি যদি রাগত চোখে পুরুষের দিকে তাকায় তার মানে বুঝতে হবে সে আসলে ওই পুরুষ মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই সে যখন না বলছে বা প্রতিবাদ করছে, আসলে সে যৌনমিলনে আগ্রহী।

এও এক বিশ্বাস ও ধারণাজনিত বিকৃতি।

পুরুষমানুষের যৌন ইচ্ছা জাগলে তার পূর্তি হতেই হবে। যেহেতু সে পুরুষ তাই ইচ্ছা হলে সে যেকোনো নারীকেই যৌনমিলনে আহ্বান জানাবে এবং সেই নারীটি প্রতিবাদ করতে পারবে না।

পুরুষ চাইলে নারী বাধ্য নিজেকে যৌনমিলনে উৎসর্গ করতে। সে ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো গুরুত্ব নেই।

দিল্লির 'নির্ভয়া' কাণ্ডে ধৃত আসামীর বয়ান থেকেই বোঝা যায় যে পুরুষ জাতির এক নির্ধারিত কর্তব্য হল ধর্ষণের মাধ্যমে নারীকে শাস্তি দেওয়া। যেসব নারী সমাজের চোখে খারাপ-- অচ্ছে ঘর কি না হো, তাদের শাস্তি দিতেই পুরুষকে মাঝে মাঝে নিজের যৌনাঙ্গকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। কেন ধর্ষণ করলে কী হবে?

শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে হবে সম্মানহানি। আমাদের দেশে ধর্ষক বুক ফুলিয়ে ঘোরে কিন্তু ধর্ষিতা আত্মহননে বাধ্য হয়, কারণ সমাজ আঙুল তুলে বলে এই নারী ধর্ষিতা তার মানে এ নিশ্চয় খারাপ তাই পুরুষমানুষ তাকে 'নষ্ট' করেছে। এঁটো হয়ে গেছে সে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে সমাজের কালো মুখ। তাই ধর্ষণের মতো অপরাধে সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। আরও দু-টি বিষয় কাগজে উগ্‌রে দেওয়ার জন্য লেখনী আমার ছট্ফট্ করছে। প্রথমত, ধর্ম ও ধর্ষণ যেন সমার্থক। ধর্মীয় গুরুরা (যদিও সবাই নয়) যুগে যুগে মানুষের ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌনলালসা চরিতার্থ করেছে। ধর্ষণও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারতবর্ষের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মভীরু দেশে এই 'দেবদাসী' প্রথা বছরের পর বছর বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে নারী সমাজ। দ্বিতীয়ত, সুযোগ। সুযোগ পেলে ধর্ষণ করা যেতেই পারে এমন মানসিকতাই ধর্ষণের কারণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই হে নারী, তুমি সুযোগ দিও না। গা ঢেকে, ঘরের ভিতর মুখ লুকিয়ে জীবন কাটাও। তবে সুধী সমাজ উত্তর দিন, যারা নিজের আত্মীয়দের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছেন তারা কোথায় যাবেন? আর এমনটাও বোধহয় দাবি করা যাবে না যে মিনি স্কার্ট আর হটপ্যান্ট পরিহিতা নারীরাই ধর্ষিতা হন। ভারতীয় পোশাক (শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ) পরিহিতা নারীরা ধর্ষিতা হন না। কামদুনির ঘটনা সে কথা প্রমাণ হতে দেয় না। তাই সুযোগ পেলে নারী ধর্ষণ চলতেই পারে এমন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

পরিশেষে দু-চার কথা লিখতেই হয়। না কোনো জ্বালাময়ী বক্তৃতা নয়। খুব সাধারণ দু-চার কথা, যা প্রতিটা মা অনুসরণ করতেই পারেন। শিশুর বিকাশে মা-র ভূমিকা অপরিসীম তাই সমাজ পরিবার এসবের ঊর্ধ্বে থাকেন মা। সেইসব মা-দের উদ্দেশ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। মেয়ে সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে সন্তানটিকেও শেখান কীভাবে নারীকে মানুষ বলে সম্মান করতে হয়। যৌনজীবন নিয়ে লুকোছাপার-র প্রয়োজনীয়তা যেন মাত্রা না ছাড়ায়। আর মনে রাখবেন শিশু অবস্থায় অনেক ছেলে যৌন অত্যাচারের শিকার হয়। তারা পরবর্তী জীবনে যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে হিংসার আশ্রয় নিতে পারে। তাই সুস্থ সমাজ গড়তে সমস্ত স্তরের মায়েদের সচেতন হতে হবে। আসুন সত্যিকারের স্বাধীন হই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সাইকোলজিস্ট। শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস

(দ্বিতীয় পর্ব)

ডা. রাহুল মুখার্জি

ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস হল ব্রিটেনের সরকারি খরচে চালু সে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার নাম। উপযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট মানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুযোগ ধনী এবং দরিদ্র সকলেরই সমানভাবে পাওয়ার অধিকার রয়েছে, এই মূল উপযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট মানের ধারণাগত অবস্থান থেকেই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস যুক্তরাজ্যের সকল নাগরিকের সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা (Universal Health Coverage)-র দায়িত্ব নেয়। যেখানে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে কোনোরকম টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপার থাকে না।

NHS, তার ইতিহাস, পরিকাঠামো, বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমরা স্বাস্থ্যের বৃত্তে ital -র আগের সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এ সংখ্যায় আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে NHS-এর সমস্যার দিকগুলি খুঁজে দেখতে চাইব।

বর্তমান সময়ের NHS একটি দ্বিস্তরীয় কাঠামোর স্বাস্থ্যব্যবস্থা (2 tier healthcare delivery system). দ্বিস্তরীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থা বলতে আমরা বলতে চাইছি সেই ব্যবস্থার কথা যেখানে একটি দেশে একই সাথে একটি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পাশাপাশি আরেকটি বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা চলে। সরকারি ব্যবস্থাটি দেশের বেশিরভাগ নিম্ন আয়ের মানুষজনের স্বাস্থ্য দেখভাল করে, আর বেসরকারি ব্যবস্থায় টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা পাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এরকম দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থা চালু আছে। একটি দেশে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার গুণমানের ফারাক কতখানি হবে তা নির্ভর করে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও ব্যবস্থা দু-টি কীভাবে পরিচালিত হয় তার ওপরে। কোনো কোনো দেশে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা যথেষ্ট ভালো ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দেয়, আর বেসরকারি ব্যবস্থা তার পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থার আওতার বাইরে থাকা ক্ষেত্রগুলির পরিষেবা দিয়ে চলে, ব্রিটেনের NHS-এর ক্ষেত্রে যেরকমটা হয়েছে। অন্যদিকে তুলনামূলক অনুন্নত দেশগুলিতে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল পরিকাঠামো, পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যর্থতার সুযোগে বেসরকারি ব্যবস্থাগুলি তুলনামূলক ভালো পরিষেবা দিতে পারে, যদিও সেটা আকাশছোঁয়া মূল্যের বিনিময়েই।

কানাডার স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামো NHS-এর মতো না হলেও জনকল্যাণমুখী হিসেবে পরিচিত। সেখানে এখনও স্বাস্থ্যব্যবস্থার আদর্শ রূপ নিয়ে যত পর্যালোচনা হয়ে চলেছে, তা থেকেও আনুরিন বেভানের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত কানাডিয়ানরা বেভানের দেখিয়ে দেওয়া রাস্তাই ঠিক মনে করছেন, যেখানে সম্পদ নয়, প্রয়োজনই ঠিক করবে রোগী কী চিকিৎসা পাবেন। সকল নাগরিকের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যাবসাদারদের হাতে ছেড়ে দিলে শুধুমাত্র গরিবদেরই ক্ষতি হবে এমনটা ভাবা ভুল। এর ফলে যেটা হবে, যে গরিব মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও পাবেন না, উলটোদিকে ধনীরা অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, অহেতুক পরীক্ষানিরীক্ষা, অহেতুক অপারেশনের কোপে পড়বেন।

তারপরেও ইংল্যান্ড ও কানাডার অনেক ধনী মানুষ (যারা এতদিন NHS বা কানাডার সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকেই সমস্ত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুবিধা নিতেন) এখন মনে করেন, 'পয়সা থাকতে আমি লাইনে দাঁড়াতে যাব কেন? যার উপায় নেই সে সরকারি ফ্রি স্বাস্থ্য নিতেই পারে, কিন্তু আমি কেন পয়সা থাকা সত্ত্বেও প্রাইভেটের ঝিনচ্যাক স্বাস্থ্য কিনে নিতে পারব না?' আমেরিকায় ঠিক এই জিনিসটাই হয়েছে। সেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোটাই চলে ব্যক্তিগত হেলথ ইন্সুরেন্স-এর মাধ্যমে। তার ফলে যেটা হয়, যে ইন্সুরেন্স কেনার ক্ষমতা রাখে না সে চিকিৎসা পায় না আর যাদের ইন্সুরেন্স করা আছে তাদের ক্ষেত্রে ইন্সুরেন্সের টাকা পাওয়ার লোভে অপ্রয়োজনীয় অপারেশন, অবৈজ্ঞানিক অহেতুক পরীক্ষানিরীক্ষা করানো হয়। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ--

আমেরিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি হার্টের অপারেশন হয়, (যার মধ্যে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি, অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি ইত্যাদি পড়ে)। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে যে দেশ রয়েছে তার তুলনায় ৪৫% বেশি। তার মানে তো এই নয় যে এত এত অপারেশন করার ফলে আমেরিকার মানুষদের হার্টের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো! বরং দেখা গেছে আমেরিকায় হার্টের অসুখ অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর এসব অপারেশন করার পর যে রোগী আগের সুস্থ স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবনে ফিরতে পারেন তাও নয়। নেহাত কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। তাছাড়া এসব অপারেশনে জীবনের ঝুঁকিও খুব একটা কম না। যেখানে অপারেশন না করে এসব রোগ যাতে না হয় সেসব উপায় (preventive measures) অবলম্বন করলে অনেক বেশি ভালো থাকা যায়, আর তার খরচাও কম।

বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় পয়সাওয়ালা রোগীদের প্যাকেজ দেয় নিয়মিত হেলথ চেক-আপ করানোর জন্য, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়। নেহাত অপ্রয়োজনে X-Ray বা CT Scan ইত্যাদি করানো হয়, যা দেহে বিকিরণের মাত্রা বাড়িয়ে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

ভারতের মতো অনেক দেশেই বেসরকারি ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই আপৎকালীন চিকিতসা (Emergency Care) পরিষেবা দেয় না, বিশেষ করে শহরের বাইরে। তাই দুর্ঘটনা, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপে কাটা এসব ক্ষেত্রে ধনী গরিব সকলকেই সরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আসতে হয়। আর ভারতের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশে সরকারি ব্যবস্থ্যায় এই আপৎকালীন চিকিৎসার ব্যবস্থা দুঃখজনকভাবে বেহাল।

সরকারি ব্যবস্থা উঠে গিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের ফলে উন্নত দেশগুলিতে ব্যাবসার একদিক থেকে ক্ষতি হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে, সেখানে বেশিরভাগ কোম্পানি তাদের কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্যে আর্থিক সুবিধা দিতে বাধ্য। অপ্রয়োজনে চিকিৎসা করানোর ট্রেন্ড চলে আসায় কর্মচারীদের চিকিৎসায় আর্থিক সুবিধা দিতে চাইছে না বা পারছে না অনেক কোম্পানি। তাই ঘুরপথে অনেক ব্যবসায়ী কিল হজম করে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার পক্ষে সওয়াল করছেন। কানাডায় টরেন্টো ডোমিনিয়ন ব্যাংকের CEO চার্লস বেইলি কানাডার সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে সওয়াল করে বলেছেন, এটি দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি, এটিকে হারানো উচিত হবে না।

সাম্প্রতিক সময়ে ত্রিনিদাদ টোবাগোর মতো ছোটো দেশের সরকারও সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিয়েছে। দেশের সমস্ত নাগরিক বিনামূল্যে এই ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছেন। দেশের সামান্য ক-টি বড়ো হাসপাতাল ও অগণিত ছোটো হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং প্রায় ২৫০ খানা সরকারি ফার্মেসি দিয়েই সুন্দর এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা গেছে। সাহায্য দিচ্ছে Chronic Disease Assistance Programme (CDAP). সমস্তরকম দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন--ডায়াবেটিস, হাঁপানি, হৃদ্রোগ, গাঁটের ব্যথা, গ্লুকোমা, মানসিক অবসাদ, উচ্চ রক্তচাপ, প্রস্টেটের সমস্যা, মৃগী, পারকিনসনস ডিজিজ, থাইরয়েডের অসুখ ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়েছে সমস্ত নাগরিককে।

ত্রিনিদাদ টোবাগো, শ্রীলঙ্কার উদাহরণ দেখিয়ে দেয় যে সবার জন্যে উপযুক্ত স্বাস্থ্য কোনো আকাশকুসুম দিবাস্বপ্ন নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সীমিত উপকরণ দিয়েও তৈরি করে ফেলা যায়। রোগ সারানোর চিকিৎসা (Curative Treatment) স্বাস্থ্যের একটি মাত্র অঙ্গ নয়। রোগ হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা (Preventive Treatment) করা, মানুষকে সেই বিষয়ক জ্ঞানের সাথে পরিচয় করানো--সেটাও স্বাস্থ্যের এক অনস্বীকার্য অঙ্গ। শুধু রোগ হওয়ার পর তার চিকিৎসা করার মাধ্যমে যে দেশের সার্বিক জনস্বাস্থ্য ভালো হবে সে ধারণাকে দুর করে দেওয়াই ভালো। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মূল লেখা ব্রিটেনে কর্মরত চিকিৎসক ডা. রাহুল মুখার্জির লেখা থেকে অনুবাদ করেছেন ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিউ

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজ স্ট্রিট, কফিহাউস (তৃতীয় তল), কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২ ৯৮৩০৮৪৭১৫৯

চামড়ার ছত্রাক সংক্রমণ-সমস্যা কি বাড়ছে?

ডা. জয়ন্ত দাস

আমরা যারা চর্মরোগের ডাক্তারি করি, তারা কিছু বছর ধরে একটা ব্যাপার হাড়ে হাড়ে বুঝছি। দাদ হাজা জাতীয় একদা এলেবেলে চর্মরোগগুলো সারানো খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দাদ। দাদ বলতে আমরা সাধারণত গায়ে গোল গোল চাকা চাকা উঁচু দাগ, প্রবল চুলকানি, আর ভাঁজের দিকে (কুঁচকি, বগল, থাই-এর ভেতর দিক, মহিলাদের স্তনের তলার ঘাম-জমা জায়গায়) অবস্থান—এরকম চর্মরোগই বুঝি। কিন্তু নখে, চুলের গোড়ায়, মুখে—এই একই জীবাণু বা ছত্রাক চর্মরোগ তৈরি করতে পারে। সাধারণ ভাষায় সেগুলোকে দাদ না বললেও, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে এরা একই রোগ, চিকিৎসাও একই ধরনের--লিখছেন ডা. জয়ন্ত দাস।

গত কুড়ি বছর ধরে সারা ভারত জুড়ে দাদ-এর প্রকোপ বেড়েছে, আর আরও বেড়ে চলছে। আগে শীতকালে দাদ দেখাই যেত না, গরম আর বর্ষাকালেই ছিল তার রমরমা। এখন শীতকালেও দাদ সারছে না। কলকাতা, মুম্বাই, আমেদাবাদ, চেন্নাই—এ সব জায়গাতেই সমীক্ষা হয়েছে, দাদ সত্যি বাড়ছে। যেখানে সমীক্ষা হয়নি সেখানেও চর্মরোগবিশেষজ্ঞদের এক কথা। বাড়ছে। কিন্তু কেন? কেউ জানি না।

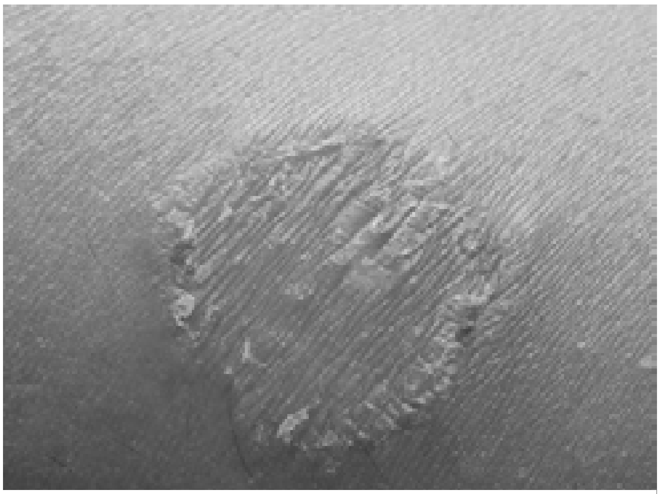

চিত্র ১. দাদ

আমাদের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই দাদ বেশি হয়। কিন্তু আর পাঁচটা রোগের মতো, এই রোগের গবেষণার জন্য আমরা পাশচাত্যের দিকেই তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হই—আমাদের যে তেমন গবেষণা ব্যবস্থা নেই! কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা হয়ে যাবার পর আমরা বুঝছি, ওদের দেশ থেকে আসা গাইডলাইন মেনে চিকিৎসা করে আমাদের এই নতুন মহামারী কমবে না। ওদের দেশে যে ওষুধগুলো দিব্যি কাজ করে সেগুলোই আমরা টেক্সট বই আর আন্তর্জাতিক জার্নালগুলোতে পড়ি, কিন্তু কাজে লাগাতে গিয়ে দেখি রোগ সারছে না। ওরা বলছেন, গ্রিসিওফালভিন ওষুধটা দিনে ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিগ্রাম ডোজে দু-চার সপ্তাহ খেলে রোগ সারবে। আমরা দেখছি ঐ ওষুধ কোনো কাজেই লাগছে না, ওষুধ খেতে খেতেই রোগ বাড়ছে। অথচ দশ বছর আগে গ্রিসিওফালভিন লিখে দিয়ে রোগীকে প্রায় নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেত, রোগ চলে যাবে। ফ্লুকোনাজোল কিছুদিন বেশ কাজের ওষুধ ছিল, যদিও ওই ওষুধটা অন্য রোগের জন্য রিজার্ভ রাখতে বলা হত বলে কম ব্যবহার করা হয়েছে। এখন ফ্লুকোনাজোল অকেজো।

এখন বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে টারবিনাফাইন (terbinafine) আর ইট্রাকোনাজোল (itraconazole)। কাজ কতটা হচ্ছে সেটা বলার আগে এই দুটো ওষুধের কিছু অসুবিধের কথা বলা দরকার। প্রথম অসুবিধা হল দাম। প্রাপ্তবয়স্ক হলে, টারবিনাফাইন ২৫০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট রোজ একটা করে খেতে হয়। যে সব ওষুধ বাজারে মেলে সেগুলোর এক-একটা ট্যাবলেটের দাম দশ টাকার বেশি। তথাকথিত ‘জেনেরিক’ টারবিনাফাইন-এর দাম কিছু কম, কিন্তু বাজারে মেলে না। সরকারি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে যা মেলে, তাতে লেখা দাম বেশ বেশিই দেখি, ছাড় অনেকটা, অর্থাৎ বেশি দামের স্টিকার লাগিয়ে ‘কম দামে দিচ্ছি’ মার্কা সেল। আসল ‘ইন্টারন্যাশনাল নন-প্রোপ্রাইটরি নেম’, অর্থাৎ কেবল ‘টারবিনাফাইন’ নামটুকুই ওষুধের গায়ে লেখা থাকবে, আর কোম্পানির দেওয়া ‘ব্র্যান্ড’-নাম থাকবে না—এমন ট্যাবলেট আজও চোখে দেখিনি, সুতরাং তার দামও জানি না। টারবিনাফাইন অবস্থাভেদে দু-সপ্তাহ থেকে দু-মাস খেতে বলা হত আগে, কিন্তু এখন কাজ হচ্ছে না, ফলে আরও অনেক বেশিদিন ধরে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। শুরু হয়েছে দিনে ৫০০ মিলিগ্রাম করে টারবিনাফাইন খাওয়ানোর চল, কেননা তাতে নাকি কিছু ফল হচ্ছে, যদিও খুব ভালো সাক্ষ্যপ্রমাণ মজুত নেই। এখন অবশ্য ডাক্তারবাবুরা ছত্রাকের চিকিৎসা করতে গিয়ে

'ভালো সাক্ষ্যপ্রমাণ' দেখে তবেই লিখবেন, এমন বলতে পারছেন না। কেননা পুরোনো ওষুধ পুরোনো ডোজে দিলে রোগ সারবে এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ বইতে আছে ভূরি ভূরি, কিন্তু সারছে না, সেটা তাঁরা নিজের চোখে দেখছেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। সে যাই হোক, এতে খরচ বাড়ছে। এই সেদিন গ্রিসিওফালভিন চার সপ্তাহ দিয়ে মোট খরচ হত ১২০ টাকার কম, রোগ সাধারণত সেরে যেত। এখন টারবিনাফাইন চার সপ্তাহ দিয়ে মোট খরচ হচ্ছে তিনশো টাকার বেশি, এবং রোগ সাধারণত সারছে না। টারবিনাফাইন ৫০০ মিলিগ্রাম ছয় থেকে আট সপ্তাহ দিয়ে মোট খরচ হচ্ছে হাজারখানেক টাকা, রোগ সারবে, এমন বলা যাচ্ছে না। উপরন্তু টারবিনাফাইন দিলে, বিশেষ করে বেশি ডোজে দিতে বাধ্য হলে, রোগীর রক্তপরীক্ষা করতে হচ্ছে,

চিত্র ২. হাজা বা টিনিয়া পেডিস

সেটাও বেশ খরচের। লিভার ফাংশন টেস্ট বলে একটা পরীক্ষা আছে, বড়ো ল্যাবরেটরিতে সে পরীক্ষা করতে প্রায় হাজারখানেক টাকা নেয়। ছোটো ল্যাবরেটরিতে অবশ্য খরচ কম, কিন্তু ডাক্তার ও রোগীর উভয়ের আস্থাও কম। কিডনির কার্যকলাপ কেমন আছে, সেটা দেখার জন্য মাঝেমধ্যে রক্তের ক্রিয়াটিনিন ও ইউরিয়া দেখতে হয়, তারও খরচ আছে। এর ওপর আছে ডাক্তারের কাছে বারবার যেতে হবার বাধ্যবাধকতা, অর্থাৎ সময় খরচ, ডাক্তারের ফি! সব মিলিয়ে খরচ বোধহয় আগেকার চাইতে দশগুণ বেড়েছে। অথচ চামড়া (বা নখ, চুল-এ) দাদ জাতীয় সংক্রমণ গরিবদেরই বেশি হয়। শুধু বেশি হয় তা-ই নয়, প্রথমে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে লাগানো বা খাওয়ানোর সম্ভাবনা গরিবদেরই বেশি। আর তাতে রোগ প্রায় সব ক্ষেত্রে বেড়ে যায়, ওষুধে কাজ করে না। ফলে সামান্য (?) একটা চর্মরোগে গরিবের একমাসের সমস্ত রোজগার চলে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

ইট্রাকোনাজোল (itraconazole) টারবিনাফাইন-এর চাইতেও বেশি খরচের। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণ যে ডোজ সাহেবদের বইতে লেখা থাকে, সেটা হল দিনে ১০০ মিলিগ্রাম, ১ সপ্তাহ থেকে ৪ সপ্তাহ। ১০০ মিলিগ্রাম এক-একটা ক্যাপসুলের দাম ১২ টাকা থেকে ৫০ টাকা। তথাকথিত 'জেনেরিক' ইট্রাকোনাজোল-এর দাম কিছু কম, কিন্তু বাজারে এটাও বিশেষ মেলে না। সরকারি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে মেলা ওষুধের ব্যাপারে ইট্রাকোনাজোল-এর অভিজ্ঞতা টারবিনাফাইন-এরই মতো। 'ইন্টারন্যাশনাল নন-প্রোপ্রাইটরি নেম', যাতে কোম্পানির দেওয়া 'ব্র্যান্ড'-নাম থাকবে না—তেমন ইট্রাকোনাজোল পাওয়া ভার। তার ওপর, বিলিতি বইয়ে লেখা ডোজে ইট্রাকোনাজোল দিয়ে কাজ হচ্ছে না, টারবিনাফাইন-এরই মতো। টারবিনাফাইন খাইয়ে কাজ হয়নি, এমন রোগীদেরই সাধারণত ইট্রাকোনাজোল দেওয়া হয়, সেখানেও কাজ না হলে রোগী যান ক্ষুব্ধ হয়ে, কিন্তু ডাক্তারই বা কী করবেন? অগত্যা বেশি ডোজে ইট্রাকোনাজোল দিতে হয়। দিনে ২০০ মিলিগ্রাম তো বটেই, দিনে ৪০০ মিলিগ্রাম দেবারও দরকার পড়ে অনেক সময়। বেশি ডোজ মানে খরচ বাড়ল। চার থেকে আট সপ্তাহ দিনে ৪০০ মিলিগ্রাম ইট্রাকোনাজোল দেবার দরকার হয়,

আমাদের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই দাদ বেশি হয়। কিন্তু আর পাঁচটা রোগের মতো, এই রোগের গবেষণার জন্য আমরা পাশ্চাত্যের দিকেই তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হই—আমাদের যে তেমন গবেষণা ব্যবস্থা নেই!

সেখানে বাজার থেকে কেনা মোটামুটি সস্তাদামের যে ব্র্যান্ড পাওয়া যায়, তার জন্য ওষুধের দামই পড়ে ১৩০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা। আর ইট্রাকোনাজোল খাওয়াতে গেলেই লিভার ফাংশন টেস্ট করতে হয়, আরও পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়, তার খরচ নিদেনপক্ষে ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা। ডাক্তারের ফি এর ওপরে, সময় খরচ, কষ্ট আর ভোগান্তি তো হিসেবের মধ্যে ধরাই যাবে না।

কিন্তু আগে যে সব ওষুধে কাজ করত সেগুলো আজ ছত্রাক সংক্রমণে অকেজো হয়ে গেল কেমন করে? সেটা বলা মুশকিল, কেননা বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা বড়ো বড়ো ল্যাবরেটরিতে বসে দেখেছেন, পেট্রিডিশে ছত্রাক কালচার করে তার ওপর ওষুধ দিলে, ছত্রাকগুলো মরে যাচ্ছে। অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণা দেখাচ্ছে, ছত্রাক মরছে বটে, কিন্তু আগে যে ডোজের ওষুধ মরত এখন তার থেকে বেশি ডোজের ওষুধ লাগছে অনেক ক্ষেত্রেই। আর একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে। যে ছত্রাক-প্রজাতি আমাদের দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বেশির ভাগ দাদ-এর কারণ ছিল, তারা সংখ্যায় তুলনায় কমছে, অন্য প্রজাতির ছত্রাক বাড়ছে। অন্য এই প্রজাতির ছত্রাক আগে ছিল না, তা কিন্তু নয়, এখন আগের তুলনায় তারা ধীরে ধীরে সংখ্যাগুরু হয়ে উঠছে, এইমাত্র। এসব তথ্য থেকে তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া মুশকিল। বিশেষ করে চিকিৎসা কীভাবে করতে হবে, কী করলে রোগ নিশ্চিতভাবে সারবে, অন্তত প্রায় সবক্ষেত্রে সারবে, সে ব্যাপারে এসব গবেষণা এখনও পর্যন্ত তেমন আলোকপাত করতে পারেনি।

২০১৬ সালের মার্চ-এপ্রিলে বেরোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের জার্নালের প্রবন্ধ বলছে—

"কুঁচকির আর গায়ের দাদ আগে সহজে সারানোর অসুখ বলেই ভাবা হত, এখন সেটা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। . . . এইসব কঠিন দাদ সারানোর জন্য কোন উপায় নেওয়া হবে সে নিয়ে একমতে পৌঁছোনো যায়নি। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা মুখে খাবার নানা ফাঙ্গাসের ওষুধ একসাথে দিচ্ছেন, বেশি ডোজে ফাঙ্গাসের ওষুধ দিচ্ছেন, বেশিদিন ধরে ওষুধ দিচ্ছেন, . . . কিন্তু এসব হল লাগে তুক না লাগে তাক গোছের প্রচেষ্টা, কোনো সাক্ষ্যনির্ভর সুনির্দিষ্ট প্রয়াস নয়।" [সূত্র: Indian Dermatol Online J. 2016 Mar-Apr; 7(2): 73-76.]।

একবছর পরে দেখছি, ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ডার্মাটোলজি বিশেষ পথ দেখাতে পারছে না, কিন্তু সমস্যা নিয়ে কীভাবে গবেষণা চালানো দরকার সেটা ঠিক করার চেষ্টা করছে—"অনেকের মতে অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধে রেজিস্ট্যান্সের জন্য দাদ-জাতীয় ছত্রাক সংক্রমণ ওষুধে সারছে না। . . . ব্যাকটিরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিকে রেজিস্ট্যান্স প্রমাণ করার চাইতে ছত্রাকের অ্যান্টিফাঙ্গালে রেজিস্ট্যান্স প্রমাণ করা শক্ত . . . [ল্যাবরেটরিতে দেখা অ্যান্টিফাঙ্গালে ছত্রাকের রেজিস্ট্যান্স] ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছে না . . . দাদ- জাতীয় ছত্রাকের ক্ষেত্রে

যে ছত্রাক-প্রজাতি আমাদের দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে বেশির ভাগ দাদ-এর কারণ ছিল, তারা সংখ্যায় তুলনায় কমছে, অন্য প্রজাতির ছত্রাক বাড়ছে।

ল্যাবরেটরি-মান ঠিক কী হলে অ্যান্টিফাঙ্গাল কোনো ওষুধ একটি ছত্রাককে মেরে-ফেলার মতো কার্যকর, মাঝারি কার্যকর, বা একেবারে রেজিস্ট্যান্ট, তা বলার মতো যথেষ্ট . . . তথ্য নেই।"[সূত্র: http://www.e-ijd.org/article.asp?issn=0019-5154;year=2017;volume=62;issue=3;spage=227;epage=236;aulast=Verma]

এসব জেনে সাধারণ মানুষের তেমন লাভ নেই, কিন্তু মোদ্দা কথাটা বোধহয় বোঝা গেল। ডাক্তাররা এখন যে আর আগের মতো 'সাধারণ দাদ'-কে সারাতে পারছেন না, সেটা ব্যক্তি-চিকিৎসকের দোষ নয়। যদিও অন্য অর্থে কিছু দোষ থাকতে পারে, সে কথায় পরে আসছি।

কেন দাদ-এর ছত্রাক ওষুধে মরছে না, সে নিয়ে একবারে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু কয়েকটা বিষয় দায়ী হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। মনে রাখতে হবে, এটা এখনও পর্যন্ত আমাদের উপমহাদেশের নিজস্ব কীর্তি, অন্য সব দেশে এই সমস্যা নেই তেমন। আচ্ছা, পৃথিবীতে এত লোক থাকতে আমাদেরই এত বেশি আর এত রেজিস্ট্যান্ট রকমের ছত্রাক সংক্রমণ হচ্ছে কেন?

কয়েকটা সাধারণ কারণ আছে, যেগুলো থাকলে যে কারও ছত্রাক সংক্রমণ বেশি হবে। যেমন গরমে থাকা, বেশি ঘামা, টাইট জামাকাপড় বিশেষ করে টাইট অন্তর্বাস পরা। আপনাকে গরমে কাজ করতে হয়, দিনের মধ্যে ষোলো ঘণ্টা প্যান্ট-শার্ট-জাঙ্গিয়া-জুতোমোজা পরে থাকতে হয়। ছত্রাক গরম ও ভিজে জায়গায় বেশি বাড়ে, আর ওই জামাকাপড়ের দৌলতে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে কুঁচকি, আর মহিলাদের বগল ও স্তনের নীচটা, সবসময় ভিজে আর উষ্ণ থাকতে বাধ্য। আমাদের পায়ের আঙুলগুলোর মাঝখানে ঘাম জমে, তার ওপর সভ্যতার ঠেলায় দিনরাত মোজা পরতে হয়। সুতির মোজা দামি, ছিঁড়ে যায় সহজে, তাই সস্তার নাইলন মোজা, যা চামড়ার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। জাঙিয়া ও আন্ডারওয়ার এতদিন সুতিরই চালু ছিল, এখন সস্তা-অসুন্দর ফ্যাশনের পালে হাওয়া লেগেছে আর দিনে দিনে সিন্থেটিক আন্ডারপ্যান্টের চল বাড়ছে। সুতি ভিজেভাব সামান্য কমাতে পারে, সেটাকে পুরো দূর করতে পারে না। কিন্তু হালফ্যাশনের জিনিসগুলো ত্বককে ঘামে ভিজে রেখে দেয়। আমাদের জলবায়ু অনুসারে সবথেকে ঠিকঠাক হত হাঁটু অব্দি লুঙ্গি বা ধুতি বা শাড়ি, সামান্য গেঞ্জিজাতীয় ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক, হাওয়াই চটি। অফিসটা রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতনের মতো ছাতিমতলায় হলে ভালো, নইলে অফিসে চব্বিশ ঘণ্টা এসি চালাতে হবে। তাতে ছত্রাক হবার সম্ভাবনা কমবে, কিন্তু নানা কারণে সেটা বোধহয় হবে না।

আর দ্বিতীয় কারণটা কিন্তু আমাদের স্বখ্যাত সলিল। এই দেশে সহজেই বিনা প্রেসক্রুপশনে ওষুধ পাওয়া যায়, ডাক্তার ও পাশ-না-করা ডাক্তাররা স্টেরয়েডের সাথে অ্যান্টিফাঙ্গাল মেশানো মলম লেখেনও এন্তার, আর আপনার মতো অনেকেই সেগুলো দিনের পর দিন লাগিয়ে চলেন। দোকানদাররা ওষুধ বেচেই খুশি, দু-দশ বছর পরে তার জন্য রেজিস্ট্যান্স হবে কিনা সে নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। এছাড়া লাগানোর অ্যান্টিফাঙ্গাল ও মুখে খাবার অ্যান্টিফাঙ্গাল—এ দুটোই খুব ইচ্ছেমতো ব্যবহার করি আমরা, যতদিন লাগানোর বা খাবার কথা, ততদিন করি না, একটু আরাম পেলেই ওষুধ বন্ধ করি। ডাক্তারদের দোষ এখানেই যে তাঁদের কেউ কেউ এরকম পাঁচমেশালি ওষুধ দেন রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা না করেই। তবে তার চেয়ে বেশি ডাক্তার যেটা করেন তা হল, রোগী এলোমেলো ওষুধ লাগাচ্ছে দেখলেও সেটা নিয়ে খুব প্রতিবাদ করেন না, দোকানদার বা না-পাশ-করা-ডাক্তার বা প্রতিবেশীর ওষুধ দিয়ে ক্ষতি করার বিরুদ্ধে সরব হন না।

অবশ্য এই ডাক্তারদের মুখ-বুজে থাকারও একটা যথার্থ অ্যালিবাই আছে। রোগী আজকাল ডাক্তারদের তেমন বিশ্বাস করতে চান না, নিজের সমালোচনা করলেই চটে ওঠেন অনেকে, ভাবেন এই বুঝি ডাক্তার ওষুধ লিখে বা পরীক্ষা করতে দিয়ে কমিশন খাবার তাল করছে। ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের এমন চমৎকার পরিমণ্ডলে অপচিকিৎসা ছাড়া আর কিছু প্রশ্রয় পাবার কথা নয়, আর এদেশে তাই হচ্ছে। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

ডা. জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার

রুমঝুম ভট্টাচার্য

মানসীর বয়স ২২ বছর, সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার ছাত্রী। খুব সাম্প্রতিককালে সে মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে পরীক্ষায় বসতে পারে না এবং তাকে এক বছর পিছিয়ে পড়তে হয়। তার মা তাকে চিকিৎসার জন্য সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে যান। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায় মানসী বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় জর্জরিত। তার কয়েকটি আচরণ বিশেষভাবে ক্ষতিকর। সে হামেশাই নিজেকে আঘাত করে (Self Harm)। সে বিষাদগ্রস্ত (Depressed) হয়ে পড়ে এবং নিজেকে অপদার্থ মনে করে। তার বন্ধুর সংখ্যা খুব কম। তার একজন ছেলে বন্ধু আছে যে প্রায়ই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। মানসী সারাদিনে বেশিরভাগ সময় বিছানায় কাটায়, দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে।

পরিবার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল মানসীর মা ও বাবা দু-জনেরই মানসীর সঙ্গে সম্পর্ক শীতল, স্বাভাবিক উষ্ণতার অভাব আছে। তাঁরা বিভিন্নভাবে মানসীর কাছে এটাই উপস্থাপন করেছেন যে সফলতাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তার মায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার তুলাদণ্ডে নিজেকে বারবার তুলনা করতে গিয়ে মানসী আত্মসমালোচনা-প্রবণ হয়ে পড়েছে এবং ক্লাসে কোনো কারণে পড়াশোনায় একটু পিছিয়ে পড়লেই তার মনে হয়েছে যে তার জীবন বুঝি অকর্মণ্যতা আর ব্যর্থতায় ভরে উঠল।

এর ফলে নিজের সামান্যতম সমালোচনাও সে সহ্য করতে পারছে না। কৈশোরের শেষদিকে (Late Adolescent) দেখা গেল মানসী তার আবেগজনিত বিক্ষিপ্ততার কারণে একা থাকাই শ্রেয় মনে করেছে এবং প্রায়ই নিজেকে আহত করে ফেলছে—যেমন ব্লেড দিয়ে হাত কাটছে।

মানসীর এই ইতিহাস থেকে থেকে বর্ডারলাইন পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বর্ডারলাইন পার্সনালিটি ডিজঅর্ডার: লক্ষণ ও চিকিৎসা

ডি.এস.এম ৫ (DSM-5) অনুযায়ী পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীর প্রধানত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

১. রোগী যে পরিমণ্ডলে বাস করে সেই পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রত্যক্ষণ (perception) বা আবেগ (affect) ও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত আকার ধারণ করবে।

২. পরিস্থিতির রকমফের হলেও রোগীর প্রতিক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কেবলমাত্র পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন করেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

৩. দীর্ঘদিন যাবৎ এই রোগীর প্রত্যক্ষণ, বা আবেগ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হতে থাকবে।

৪. অন্য কোনো মানসিক রোগের জন্য বা কোনো নেশার কারণে এই পরিবর্তন লক্ষিত হবে না।

এ. পি. এ. (APA, 2013) পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারগুলিকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে নথিভুক্ত করেছে—ক্লাস্টার এ, ক্লাস্টার বি, ক্লাস্টার সি।

বর্ডারলাইন পার্সনালিটি ডিজঅর্ডার ক্লাস্টার বি এর অন্তর্ভুক্ত—নাটুকে প্রকৃতির, আবেগপ্রবণ, এবং মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত আচরণ—এগুলি এ রোগের বিশেষত্ব।

বর্ডারলাইন পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারের প্রধান বিশেষত্ব হল এই অসুখে রোগীর মেজাজ ঘন ঘন পালটাতে থাকে। যার প্রভাব তার আচরণ ও তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষদের ওপরেও পড়ে। এই পরিবর্তিত মেজাজের কারণে সে কখনো-কখনো হঠকারী কাজ (IMPULSIVE ACTION) করে ফলে, নিজেকে আহত করে, আত্মহননের প্রবণতা দেখা দেয়। নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি চিহ্নিত করা হয় রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে—

বর্ডারলাইন পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারের প্রধান বিশেষত্ব হল এই অসুখে রোগীর মেজাজ ঘন ঘন পালটাতে থাকে। যার প্রভাব তার আচরণ ও তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষদের ওপরেও পড়ে।

➢ ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেমন—ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব ধারণা (SELF IDENTITY) ও নিজের জীবনের উদ্দেশ্য(-SELF DIRECTION) এ দু-টি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

➢ ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেমন—ঘনিষ্ঠ ও কাছের মানুষদের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এর সঙ্গে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রাবোধও অনেকক্ষেত্রে নষ্ট হয়। মনের মধ্যে কাল্পনিক একাকীত্ব বাসা বাঁধতে পারে বা অসংযত আবেগ ও আচরণের কারণে সত্যি সম্পর্কগুলো ভেঙে গিয়ে একাকীত্বের সৃষ্টি হয়।

➢ বিভিন্ন নেতিবাচক আবেগ যেমন—বিষাদ, উদ্বেগ, নিরাপত্তার অভাববোধ রোগীকে গ্রাস করে।

➢ হঠকারিতা (IMPULSIVITY) এবং বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়ার(RISK TAKING) প্রবণতা দেখা যায়।

➢ আক্রমণাত্মক আচরণ বাড়ে। সামান্যতম সমালোচনায় বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখা যায়।

চিকিৎসা

বর্ডারলাইন পার্সনালিটি ডিজঅর্ডারে ওষুধ বিশেষ প্রয়োগ করা হয় না। অসংযত আবেগ ও বিষাদ বা উদ্বেগের চিকিৎসা হিসাবে সাইক্রিয়াট্রিস্ট কিন্তু ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের সাইকোথেরাপি ভালো কাজ করে। যেমন—

কগ্‌নেটিভ থেরাপি

এই চিকিৎসায় রোগীর চিন্তা ও বিশ্বাসের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করা হয়।

ডায়ালেকটিক বিহেভিয়ার থেরাপি

এই ধরনের চিকিৎসায় রোগীর বর্তমান সমস্যা ও তার আবেগজনিত অসুস্থতা সম্বন্ধে রোগীকে সচেতন করা হয়। তার মানসিক চাপ কমানোর জন্য বিভিন্নভাবে পরিস্থিতিকে স্থিরচিত্তে গ্রহণ করার ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

স্কিমা ফোকাসড্ থেরাপি

রোগীর অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস থেকে একটি বিশেষ ধরনের ধারণা (SCHEMA) গড়ে ওঠে। সে সেই গঠিত ধারণা দিয়েই সব পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা করতে থাকে ও সেইমতো প্রতিক্রিয়া তার মনে তৈরি হয়। এই রোগে নিজের সম্পর্কে যে পরিবর্তিত ধারণা তৈরি হয় তা অনেকক্ষেত্রেই এই ত্রুটিপুর্ণ স্কিমা-র ফল। তাই এই থেরাপিতে রোগীর মনোগত ধ্যানধারণার এই বোধ-সৌধটি নতুন করে ও ইতিবাচক উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়।

বর্ডারলাইন পার্সনালিটি নামক রোগ পরিবারের সুখশান্তি অনেকটাই নষ্ট করে, তাই এই সমস্যার যত তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় ততই ভালো। রোগ চিহ্নিত করে চিকিৎসা শুরু করা হলে, দ্রুত ফল পাওয়া সম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সাইকোলজিস্ট।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজস্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজস্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়া হাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

ফোন-৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

বন্যার জল কি শুধু ধ্বংসই করে?

ডা. সুমিত দাশ

চিত্র. মালদায় মেডিক্যাল ক্যাম্প-এ শ্রমজীবি স্বাস্থ্য উদ্যোগের টিম

গ্রামটার নাম জগন্নাথপুর। মালদা। মেডিক্যাল ক্যাম্প শেষ করে যখন ছোটো ভুটভুটি নৌকাটাতে আমরা পনের ষোলজন চেপে বসলাম, দেখলাম নৌকার ধার প্রায় জল ছুঁই ছুঁই। সবাইকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হল বেশি নড়াচড়া না করতে। চারিদিকে কয়েক কিলোমিটার জলের বেড়া দেওয়া মধ্যে দ্বীপের মতো জেগে থাকা গ্রামটিকে পেছনে রেখে জল কেটে আমরা এগিয়ে চলেছি। মাঝি নির্লিপ্তভাবে বলে চলেছে সব চাষের ক্ষেত ছিল এখন এখানে এক মানুষ জল ওখানে দু-মানুষ জল। কোথাও বা ডুবে থাকা পাট গাছের ডগা দেখিয়ে আন্দাজ করতে বলল জলের গভীরতা। একটা জায়গা দিয়ে আসার সময় বলল ওখানটায় একটা নদী আছে, জল অন্তত কুড়ি ফুট। বুকটা কেঁপে উঠল। নৌকা ডুবলে সাঁতার জানি কিন্তু এই বয়সে এই বিপুল জলরাশি সাঁতরে ডাঙায় ওঠা আর বিনা অক্সিজেনে এভারেস্টে ওঠা দুই-ই আমার কাছে সমান। তাই ওই ভাবনা বাদ দিয়ে দিগন্তে তাকালাম। সূর্যাস্ত হচ্ছে। শুরু হয়েছে আকাশে রঙের খেলা। তার প্রতিফলন হচ্ছে জল কেটে যাওয়া নৌকার তোলা ঢেউয়ের মাথায়। কোথাও বা জেগে থাকা কয়েকটা গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সোনালী রূপালি লালের খেলা। আনমনা হয়ে গেছি। ভাবছি বন্যার জল শুধু ধ্বংসই করে না সৃষ্টি করে কিছু অসাধারণ দৃশ্য কল্প। হঠাৎ সমবেত আতঙ্কের চিৎকার। সবথেকে চেঁচাল আমার পেছনে বসে থাকা আমাদের দলের কনিষ্ঠা সদস্য জয়নী। নৌকা প্রবলভাবে দুলে উঠেছে। কী ব্যাপার? আমাদের দলের একজন এই রঙের খেলা মোবাইলবন্দি করতে অতি উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়েছে তার ফলে এই বিপত্তি। তাকে ধমকে বসিয়ে দেওয়া হল। যাইহোক এরপর আর কোনো কাঁপুনি ছাড়াই নৌকা ভিড়ল রাস্তার পাশে। যেখানে ত্রিপলের নীচে সংসার পেতেছে অসংখ্য মানুষ। আমাদের ফেরার তাড়া ছিল। এই ভালুকা বলে জায়গাটা থেকে মালদা স্টেশন প্রায় আড়াই ঘন্টার পথ। সেখান থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ধরে শিয়ালদা। শেষ থেকে শুরু করলাম। এবার উত্তরবঙ্গের বন্যায় আমাদের মেডিক্যাল ক্যাম্প কেমন হল শুরু থেকে বলি।

২৭ শে আগস্ট, ২০১৭ রবিবার

মালদা স্টেশানে নেমেছি সকাল সাড়ে ছ-টায়। নামতেই দেখলাম অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। গন্তব্য রায়গঞ্জ। চড়ে বসলাম আমরা চারজন। আমরা বলতে আমি, দুই সদ্য ডাক্তার নিবেদিতা আর হিমাদ্রি আর এক হবু ডাক্তার চিন্ময়। আমাদের ড্রাইভার গোপালদা ওল্ড মালদা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে NH34-এ ওঠাল। তারপর ধারাবিবরণি দিয়ে গেল সারাটা সময়—কোথায় কতটা জল ছিল কোথায় রাস্তা ডুবে গেছিল। আমরাও দেখলাম হাইওয়ের দু-পাশে এখনও জল আর জল। এদিকের রাস্তা বন্ধ। সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। আর রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার ত্রিপলের আশ্রয়ে অসংখ্য পরিবার। সহাবস্থানে আছে তাদের গোরু ছাগল।

রায়গঞ্জ পৌঁছে আমাদের থাকার জায়গা হল FIAM (Forum For Indigenous Agricultural movement)-এর এক কর্মী টিপুদার বাড়িতে। সৌজন্যে আমাদের সিনিয়ার দাদা ডা. সুদেব সাহা। স্নান করে খাওয়া দাওয়া (মাসিমা মানে টিপুদার মা এবং বোনের কড়া নজরদারিতে বেশ যাকে বলে ভরপেট্টাই) সেরে চলে গেলাম লহুজ গ্রাম। আমরা সঙ্গী হলাম স্বতস্ফুর্তভাবে বন্যাত্রানে এগিয়ে বাসা ফায়াড় ব্রিগেডের কয়েকজন কর্মীর আর সওয়ার হলাম তাদের গাড়িতে। তাদের কাছে শুনলাম বৃষ্টি হয়েছিল বারো আর তেরো আগস্ট। বৃষ্টি থামার পরে চোদ্দই আগস্ট থেকে জল বেড়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রায়গঞ্জ ভেসে গেল। আসলে জল আসে বিহার এবং আরও ওপরে নেপাল থেকে। রায়গঞ্জ, ইটাহার এবং সংলগ্ন এলাকা ভাসিয়েছে কুলিক, নাগর এবং সুই নদী। তখন জল অনেকটাই নেমে গেলেও রেখে গেছে চারিদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। ভাঙাচোরা কোথাও বা মুছে যাওয়া রাস্তাঘাট। ভেঙে পড়া বাড়ি ঘর। মরে যাওয়া ধান পাট। বড়ো গাছের গুঁড়ি বরাবরজলের দাগ।

ক্যাম্পটা করা গেল একটা স্কুল বাড়িতে। কত উৎসাহ নিয়ে কিছু বাচ্চা ছেলে বিচুলি সরিয়ে আমাদের বসার জায়গা করে দিল। আগে বন্যায় কাজ করার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমরা ওষুধ নিয়ে গেছিলাম। জলে ভেজা খোলা আকাশের নীচে থাকার জন্য একটা বড়ো সংখ্যক রোগীর হয়েছে জ্বর, সর্দিকাশি। আর একটা বড়ো সংখ্যক রোগীর হয়েছে চামড়ার রোগ। কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস অর্থাৎ চামড়ায় ক্ষতিকর পদার্থ লেগে অ্যালার্জিক প্রদাহ হওয়া, অনেক পাওয়া গেছিল। বন্যার জলে ভেসে যাওয়া নর্দমা, মরা গাছপালা, পশু পাখির পচাগলা দেহ জলে মেশে। এছাড়া ফসলের ক্ষেতে দেওয়া হয় কেমিক্যাল সার।

সবই জলে মিশে গায়ে লেগে হয় ডার্মাটাইটিস। এছাড়া দাদের মতো ছত্রাকজনিত রোগ, ফোঁড়া এবং অন্যান্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান। কিছু স্কেবিস। বেশ কিছু মানুষের দুটোই আছে--অর্থাৎ চর্মরোগ এবং সর্দি, কাশি ডায়রিয়া তুলনায় কম পেলাম। এছাড়া কিছু ক্রনিক রোগ অর্থাৎ রক্তাল্পতা, উচ্চ রক্তচাপ, বাত, সুগার ইত্যাদি। যেটাতে বন্যার আগে থেকেই মানুষগুলো ভুগছে। প্রায় দু-শো ষাট জন রুগী দেখলাম।

ফেরার পথে আমাদের সঙ্গীদের কাছে শুনতে শুনতে এলাম এদিকে বন্যার ভয়ংকরতা অন্যদিকে মানুষের এককাট্টা প্রতিরোধের মানবিক রূপ। বাড়ি-ঘর ভেসে যাওয়া মানুষের দুর্দশার কোনো সীমা ছিল না। হয়েছে মৃত্যুও। শোনা যায় কুকুরিয়া নামে এক গ্রামে জল বাড়তে বাড়তে যখন এমন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে মানুষ ধরে নিয়েছে আর বাঁচার আশা নেই--কোলের শিশুকে বড়ো হাঁড়িতে করে ভাসিয়ে দিয়েছে যদি ভাসতে ভাসতে কোনো ডাঙার সন্ধান পায়। অন্যদিকে আছে রায়গঞ্জের মানুষের বন্যার্তদের পাশে ঝাঁপিয়ে পড়া। গণ সংগঠন, সংগঠন ছাড়া সংগঠিত মানুষ, স্কুল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অফিস কর্মী যে যার সাধ্য মতো টাকা-পয়সা জামা-কাপড় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যায় নেশাড়ু মার্কামারা খারাপ ছেলেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। একটা সংগঠন পিপল ফর অ্যানিম্যাল কাজ করেছে গোরু ছাগল ও অন্যান্য পশু-পাখি বাঁচাতে। পরে দেখলাম সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের এই চিত্রটা সারা উত্তরবঙ্গে একই রকম। ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

ফিরে শুনলাম মাসিমা দুপুরে খাননি। ওনার খুব সরল যুক্তি--তোমরা না খেয়ে সারাদিন রুগী দেখছ আমি কী করে খাই। উত্তরবঙ্গীয় ভালোবাসা!

২৮ শে আগস্ট, ২০১৭, সোমবার

আজ আমরা যে গ্রামটায় যাচ্ছি, নাম পারা হরিপুর। NH34 দিয়ে রায়গঞ্জ থেকে মালদার দিকে যেতে ১৫-২০ কিলোমিটার গেলে ইটাহার। সেখান থেকে হাইওয়ে ছেড়ে ডানদিকে আরও প্রায় কুড়ি কিলোমিটার ঢুকতে হবে। এখানে বলে দিই আজ মাসিমা কোনো চান্স নেননি। সকাল বেলাতেই একপেট মাছ ভাত খাইয়ে আমাদের ছেড়েছেন।

সদ্য জল থেকে বেরোনো রাস্তার অবস্থা ভয়ংকর। খানা-খন্দে ভর্তি। কোথাও ভেঙে এতো সরু হয়ে গেছে কোনোরকমে একটা গাড়ি যেতে পারে, কোথাও বেশ কিছুটা রাস্তা ধুয়ে গেছিল। তাকে জোড়া তালি দিয়ে পুনর্নির্মাণ চলছে। দু-দিকে জল আর ভাঙাচোরা বাড়ি-ঘর। আমাদের মারুতি গাড়িটা রাস্তায় দেহ রাখল, পরে তাকে ট্র্যাক্টরে চাপিয়ে ফেরত আনতে হয়। টাটা সুমোটা কোনোরকমে গন্তব্যে পৌঁছায়। এখানে বাজারে একটা ঘরে বসে আমাদের ক্যাম্প। রোগের ধরন এক তবে পার্সেন্টেজ আলাদা। এখানে আমরা ক্রনিক রোগী বেশি দেখেছিলাম। মোট প্রায় তিনশ রুগী দেখা হয়েছিল। রাতে চলে আসি মালদা শহরে।

২৯ শে আগস্ট, ২০১৭ মঙ্গলবার

আজ শেষ দিন। এই ক্যাম্প থেকে ফেরা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। এবার আরম্ভটা বলি। মালদার মিল্কি হাইস্কুলের শিক্ষকরা এই ক্যাম্পের উদ্যোক্তা। স্বরূপ, হীরালাল, মাসুদ, জুয়েলদের মতো শিক্ষকরা এবং তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে অর্থসংগ্রহ করে। তারপর শুকনো খাবার নিয়ে পৌঁছায় এই গ্রামে। আমরা আজ ওদের সাথী। মালদা থেকে ভালুকা পৌঁছাতে সময় লাগল প্রায় আড়াই ঘন্টা, কারণ ভাঙাচোরা রাস্তা। ভালুকা হাইস্কুলে হেড স্যারের ঘরে বসে সাময়িক বিরতি। এখানের শিক্ষক হামিদুল এবং আরও কয়েকজন আমাদের সঙ্গী হল। ভুটভুটি নৌকায় জগন্নাথপুর। নৌকাটা বেশ বড়ো থাকায় যাওয়ার সময় কোনো বিপত্তি হয়নি, ডুবে যাওয়া বাড়ি, অর্ধেকের বেশি ডুবে যাওয়া ইলেক্ট্রিক পোস্টের পাশ দিয়ে গ্রামে পৌঁছালাম। সময় লাগল আধঘন্টা। বলে রাখি এবার মালদা ডুবিয়েছে ফুলহার, কালিন্দি আর মহানন্দা নদী, গঙ্গা নয়।

পৌঁছোতেই ছোট ছোটো ছেলে মেয়েরা এবং গ্রামের অনেক মহিলারা হাতে হাঁড়ি গামলা নিয়ে ছুটে এসেছিল। ভেবেছিল খাবার নিয়ে এসেছি।

যাইহোক ক্যাম্প শুরু হল। একজনের পাকা ঘরে। মানুষের চাপ ক্রমশ বাড়ছে। একসময় মনে হচ্ছিল বোরোতেই পারব না। চিৎকার চেঁচামেচি ডাক্তার দেখানোর আকুতি মিলে মিশে একাকার। অসহায় মানুষগুলোর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম। এখনে সবরকমের রুগী সমানভাবে ছিল। চারশোর কিছু বেশি রুগী দেখেছিলাম। আরও দেখতে পারলে ভালো হত। কিন্তু আমাদের ওষুধ প্রায় শেষ হয়ে গেছিল আর ফেরার তাড়া ছিল। গ্রামটি ছেড়ে যখন নৌকায় উঠেছিলাম গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছিল আমাদের বিদায় দিতে। একটু আগে যাদের চেঁচামেচি আমাদের ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল।

রাতে গৌড় এক্সপ্রেস। এমনিতেই ট্রেনে ভালো ঘুম হয় না তার ওপর এরকম তিনটে দিনের স্মৃতি। শুয়ে শুয়ে ভাবছি। দেখে আসা অসংখ্য রুগী। নতুন বন্ধু তৈরি হওয়া। পুরানো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নেওয়া। বিশেষ করে ভাস্কর, যার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। শারীরিক অসুস্থতাকে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের ক্যাম্পগুলো যেভাবে অর্গানাইজ করেছে ভাবা যায় না।

এটা জানি যতজনের কাছে পৌঁছানর দরকার ছিল আর আমরা যতজনের কাছে পৌঁছেছি সংখ্যার বিচারে নগণ্য। তাই আমাদের ক্যাম্প এই বানভাসি মানুষদের কতটা কাজে এল জানিনা। কিন্তু আমাদের নিজেদের অনেক লাভ হল। কেজো পৃথিবীর দৈনন্দিন যান্ত্রিকতা যখন মনটাকে অনুভূতিহীন করে দেয় তখন এই মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মনের মধ্যে নতুন করে আবেগের সঞ্চার হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

বস্তি জীবনে জনস্বাস্থ্য সমস্যা

ধ্রুবজ্যোতি দে

।।২।।

(গোবিন্দ) বলল, হ্যাঁ, কোথায় জলটল পাব ?

জল আর কোথায় পাবে? নয়া সড়কের মোড়ে একটা কল আছে। সেটা তো অনেক দূরে। বলে উঠোন থেকে বাড়ির ধার ঘেঁষা দোতলা বাড়িটা দেখিয়ে বলল, বাইরে দিয়ে ওই বাড়িটার পেছন দিকে যাওয়ার গলিতে যাও, নর্দমার জলে হাত পা-টা ধুয়ে এসো। . . . খুব সাফা আছে নর্দমাটা। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলল কালো কথাগুলো। . . .

গোবিন্দ বলল . . . ব্যামোট্যামো হতে পারে।

কালো হেসে উঠল . . . ব্যামো? নর্দমার জলে হাত না ধুয়ে এখানে তুমি ব্যামো আটকাবে ?

. . .

কোথায় ব্যামো নেই ? এই ঘরে, এর দেওয়ালে, চালে, মেঝেয়, সারা বস্তি, পথ, বাজার; দুনিয়াময় থিক থিক করছে ব্যামো। . . .

(উপন্যাসের অংশবিশেষ, *বিটি রোডের ধারে,* সমরেশ বসু)

বস্তির পরিকাঠামো ও পরিষেবা: জনস্বাস্থ্যে প্রভাব

ইউ.এন-এর কার্যকরী সংজ্ঞায় বস্তির যে পাঁচটি নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য স্থির করা হয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানী অ্যালন উঙ্গার ও লী ডব্লিউ.রিলী (২০০৭) একটি গবেষণাপত্রে এম.ডি.জি সম্মত বিভিন্ন নির্দেশক, তাদের সম্ভাব্য বাস্তব/আইনি পরিণতি এবং জনস্বাস্থ্যে সেগুলির অভিঘাত কী হতে পারে তা বিস্তৃত আকারে দেখিয়েছেন। যথা—

বৈশিষ্ট্য: ক. নিকৃষ্ট বাসস্থান

নির্দেশক: বিপজ্জনক জায়গায়, যেমন বন্যা/ভূমিকম্প/ধস প্রবণ এলাকা, শিল্পজাত দূষক বা জঞ্জাল জমানোর জায়গা, রেলপথ বা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ লাইনের পাশে গড়ে ওঠা বাসস্থান। টিন, কাদা, কার্ডবোর্ড, বাঁশ, ইত্যাদি ভঙ্গুর জিনিস দিয়ে তৈরি বা অযোগ্য ভিত বা পৌর বিধি মোতাবেক মালমশলা না দিয়ে তৈরি ভগ্নপ্রায়/অস্থায়ী বাসস্থান।

পরিণতি: অপরিচ্ছন্ন বাসা। বন্যা, ধস, ভূমিকম্প, আগুন, জঞ্জাল স্তুপ দহন, শিল্প দূষণের কবলে বাসস্থান। বস্তি ভেঙে বহুতল, উচ্ছেদ।

স্বাস্থ্যে অভিঘাত: দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় অনভিপ্রেত আঘাত বা আগুনে পুড়ে আহত হওয়া। আন্ত্রিক, কলেরা, হেপাটাইটিস, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য: খ. ঘনবসতি ও ঘিঞ্জি আবাস

নির্দেশক: একটি ঘরে তিনজন প্রাপ্তবয়স্কের বেশি বা মাথা পিছু পাঁচ বর্গ মিটারের কম জায়গায় বসবাস।

পরিণতি: রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

স্বাস্থ্যে অভিঘাত: যক্ষ্মা ও শ্বাসযন্ত্রের অন্যান্য অসুখ, ফ্যারিঞ্জাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ, রিউম্যাটিক হৃদ্‌যন্ত্র।

বৈশিষ্ট্য: গ. নিরাপদ পানীয় জলের অপ্রতুলতা

নির্দেশক: ৫০ শতাংশ বাসার ভিতরে বা বাইরে অল্প দূর থেকে দিনে মাথাপিছু ২০ লিটার কলের জল বা নলকূপ, সংরক্ষিত কূপ বা বৃষ্টির জল সংগ্রহেরও ব্যবস্থা নেই।

পরিণতি: জলের অভাব, জীনাণু সংক্রামিত জল সংগ্রহ।

স্বাস্থ্যে অভিঘাত: আন্ত্রিক, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধি। খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ। গ্লোমারিউলোনেফ্রাইটিস-এর মতো কিডনির অসুখ।

বৈশিষ্ট্য: ঘ. অপর্যাপ্ত শৌচালয়

নির্দেশক: ৫০ শতাংশ বাসায় পৌর পয়োপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত বা সেপটিক ট্যাঙ্ক যুক্ত বা উন্নতমানের (নিজস্ব বা সর্বাধিক দু-টি পরিবারের জন্য একটি) কূপ শৌচালয়ের সুযোগ নেই।

পরিণতি: উন্মুক্ত স্থানে বা খোলা নর্দাওমায় মলতযাগ, জল ও বায়ুদূষণ, ছুঁচো-ইঁদুরের প্রার্দুভাব, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি অনুকূল নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর চাপ।

স্বাস্থ্যে অভিঘাত: আন্ত্রিক, কলেরা, টাইফাস, হেপাটাইটিস, কৃমি ইত্যাদি সংক্রমণ, শ্বাসযন্ত্রের অসুখ, শিশুদের অপুষ্টি, বৃদ্ধি ও ওজন কমে যাওয়া ('স্টান্টিং' ও 'ওয়েস্টিং'), প্রসূতিদের স্বাস্থ্যে জটিলতা, শিশুমৃত্যু।

বৈশিষ্ট্য: ঙ. বাসস্থানের অসুরক্ষিত স্বত্ব

নির্দেশক: বাসা বা জমির প্রামাণিক দলিল অথবা বসবাসের অধিকার সংক্রান্ত কোনো বিধিসম্মত চুক্তিপত্র নেই।

পরিণতি: ভাল স্থায়ী ঘর তৈরির অধিকার থেকে বঞ্চিত, নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, উচ্ছেদ। আবর্জনা ও দূষণযুক্ত, দুর্ঘটনাপ্রবণ ও বিপজ্জনক অসুরক্ষিত স্থানে বসবাসে বাধ্যতা। অসামাজিক শক্তির চাপ।

স্বাস্থ্যে অভিঘাত: স্বাস্থ্য পরিষেবায় ঘাটতি। আকস্মিক দূর্ঘটনাজনিত আঘাত। দূষণজনিত বিষক্রিয়া। শ্বাসযন্ত্রের অসুখ। ক্যানসার। যৌনরোগ, এইডস, অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব।

ইউ.এন নির্ধারিত বস্তিবাসার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বাস্তবত জনস্বাস্থ্যে যে কী পরিমাণ অভিঘাত সৃষ্টি করে এবং তাতে বস্তিবাসীদের জীবনে কতটা স্বাস্থ্যহানি ঘটে তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিপজ্জনক স্থানে বসবাস: ১৯৮৪-তে ভুপালের কীটনাশক কারখানা থেকে 'মিক' গ্যাস নিঃসরনে ২০ হাজারের বেশি বস্তিবাসী এক রাতে মারা যান। ভূমিম্পের ফলে প্রায় ৩২ হাজার মানুষ মারা যান।

ঘিঞ্জি বাসা: ফিলিপাইন্স-এ ম্যানিলার ঘিঞ্জি বস্তির বাচ্চাদের অন্য এলাকার বাচ্চাদের তুলনায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা ৯ গুণ বেশি।

নিরাপদ পানীয় জলের অভাব: পানীয় জল সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না থাকায় পৃথিবীর অন্তত ৫০% শহরবাসী নিরাপদ জল ও উন্নত শৌচালয়ের অভাজনিত অসুখে ভুগছেন। 'হু'-র তথ্যানুযায়ী পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ সংক্রামিত জলের কারণে কেবল ডায়রিয়াতেই মারা যান।

শৌচালয়ের অভাব: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৯৯-এর একটি প্রতিবেদনে জানাযায় ওই সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রায় অর্ধেক শহরবাসী কোনো-না-কোনো সময়ে নিরাপদ পানীয় জল ও শৌচালয়ের অভাবজনিত অসুখে ভুগতেন।

খোলা নর্দমা, জমা জঞ্জাল ও আবর্জনার স্তূপ: জমা জঞ্জালের কারণে ক্ষতিকারক প্রাণীদের প্রাদুর্ভাব বাড়লে রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাজিলের সালভাদরে ইঁদুরের প্রাদুর্ভাবের ফলে লেপ্টোস্পাইরোসিস-এ আক্রান্তদের ৯৫%-ই বস্তিবাসী।

অসুরক্ষিত স্বত্বহীন আবাস: ইউ.এন-এর হিসেবে ২০০০-০২ সময়কালে পৃথিবির ৬৭ লক্ষ মানুষ বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন। স্বত্বহীনতার কারণে ভারতবর্ষে ৭৫% বস্তিবাসা সরকারি কার্যক্রমগুলির সহায়তা পায়নি।

।।৩।।

(গোবিন্দ) বাইরে এসে দেখল দোতলা বাড়িটার ছেদ থেকে দুটো ছেলে বেধড়ক ঢিল ছুঁড়ছে পেছনের নর্দমাটার দিকে। গোবিন্দ সেদিকে গিয়ে দেখল ছেলেমেয়েগুলি ন্যাংটো হয়ে নর্দমায় বসেছিল, ঢিলের তাড়া খেয়ে আবার ছুটছে সড়কের দিকে। সড়কের উপর যমদূতের মতো দাঁড়িয়েছিল মেথর একটা। . . .

কিন্তু শিশুদের দেহের ভিতরের সে বেগ আর আটকে রাখার উপায় ছিল না, তারা সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে বসে পড়ল রাস্তার ধারে ধারে।

. . . এমনি করেই বাচ্চাগুলোর প্রাতঃকৃত্য শেষ হয়। তখন কারও ঠ্যাঙে কারও পায়ে লেগে থাকে বিষ্ঠা। আবার ছোটে জলের সন্ধানে। . . .

গোবিন্দ বলে ফেলল, একটা পায়খানা নেই ?

. . . ধমকে উঠল বাড়িওয়ালা। মিসিপালটির হুকুম কে দেবে অ্যাঁ ? . . .

. . . দেয় না কেন ?

কেন দেবে ? অফসরের ঘুষের টাকা না দিলে ? বলি ঠিকা জমিতে মিসিপালটির মেথর খাটবে না। . . .

(উপন্যাসের অংশবিশেষ, *বি টি রোডের ধারে,* সমরেশ বসু)

বস্তি জীবনে স্থায়ী রোগ ব্যাধির মূলে কী ?

বস্তিবাসার বৈশিষ্ট্য নির্দেশক অপ্রতুলতাগুলি পরিণতিতে যেসব সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যহানি ঘটায় তা উপেক্ষিত থাকলে ক্রমশ পুরানো, স্থায়ী, ক্রনিক অসুখের জন্ম হয়। ২০০৭-এ রিলী প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অপর একটি গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন পৃথিবী জুড়ে বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যার মূল কারণ এই সমস্ত ক্রনিক অসুখ। সারা পৃথিবীতে ৩০ বছর বেশি বয়সি ৭২ শতাংশের অসুস্থতার কারণই হল ক্রনিক অসুখ। ভারতের ক্ষেত্রে এই হার ৫৩ শতাংশ। এছাড়া রয়েছে বিষম বা প্রকট (অ্যাকিউট) কিছু ব্যাধি এবং অভ্যাস বা আচরণজনিত অসুখ যা উপেক্ষিত থাকলে ক্রনিক অসুখের জন্ম দেয়। ঠিকমতো চিকিৎসা না পেলে এই ধরনের পুষে রাখা অসুখের যেসব জটিলতা ও পরিণতি দেখা যায় তা তাঁরা তালিকাবদ্ধ করেন:

ক. স্থায়ী সংক্রামক ব্যাধি

১. যক্ষ্মার প্রকাশিত বা গুপ্ত সংক্রমণ: শেষ পর্যায়ের যক্ষ্মা, ওষুধ প্রতিরোধী বা মাল্টি-ড্রাগরেজিস্ট্যান্ট (এম.ডি.আর) যক্ষ্মা।

২. হেপাটাইটিস বি, সি: যকৃতের পচন (সিরোসিস), ক্যান্সার।

৩. এইচ আই ভি: এইডস ও সংশ্লিষ্ট অসুস্থতা।

খ. স্থায়ী অসংক্রামক ব্যাধি

১. হাঁপানি: শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসা।

২. রক্তচাপ ও হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ: মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, স্ট্রোক, কিডনির কার্যক্ষমতা হ্রাস।

৩. উপেক্ষিত মধুমেহ বা ডায়াবেটিস: পায়ে স্থায়ী ঘা, অস্টিওমাইলেটিস, কিডনির ক্ষমতা হ্রাস, মূত্রনালী ও অন্যত্র সংক্রমণ, অন্ধত্ব। (ইউরোপীয় দেশের বস্তিগুলিতে এই সমস্যা বিশেষ করে চোখে পড়ে।)

৪. আঘাতপ্রাপ্ত রেশ: স্থায়ী ঘা, ধারাবাহিক সংক্রমণ, অস্টিওমাইলেটিস, হাত পায়ের শক্তি হ্রাস, পঙ্গুত্ব, মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি।

৫. মানসিক অসুস্থতা: নিজের প্রতি অযত্ন, একগুঁয়ে আচরণ, হিংস্র মনোভাব, আত্মহত্যা বা হত্যার প্রবণতা।

৬. জনন স্বাস্থ্যের সমস্যা: বন্ধাত্ব, যৌনরোগ সংক্রান্ত জটিলতা, অনিচ্ছুক গর্ভধারণ, জন্মগত ত্রুটি।

গ. উপেক্ষিত বিষম ব্যাধি যার পরিণতি স্থায়ী অসুখ

১. চামড়ায় ঘা ও ক্ষত: জটিল জীবাণু সংক্রমণ, কিডনির অসুখ, গ্লোমারিউলোনেফ্রাইটিস।

২. গলার সংক্রমণ রুমাটিক জ্বর: হৃদ্‌যন্ত্রের কপাটিকার গোলোযোগ, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা।

৩. যৌন রোগ: জনন স্বাস্থ্যের ক্ষতি, এইডস।

ঘ. অভ্যাস ও আচরণজনিত অসুখ

১. তামাক গ্রহণ: হৃদ্‌-সংবহন তন্ত্রের অসুখ ও ক্যান্সার।

২. মদ্যপান: যকৃতের কার্যক্ষমতা হ্রাস, পচন। অনিচ্ছাকৃত আঘাতপ্রাপ্তি।

৩. মাদক বা ড্রাগের নেশা: হেপাটাইটিস, এইচ আই ভি, এইডস, এনডোকার্ডাইটিস। অনিচ্ছাকৃত আঘাতপ্রাপ্তি।

ওপরের এই তালিকাটি চূড়ান্ত মনে করার কোনো কারণ নেই। বস্তির শ্রমজীবী মানুষ, যাঁদের কাজ ঠেকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই, অর্থের অভাবে পরিচ্ছন্ন স্থানে অস্বাস্থ্যকর খাবার অসময়ে খাওয়ায় তাঁরা ধীরে ধীরে অস্ত্রনালীর ক্রনিক অসুখে পড়ে যান, যার উল্লেখ এই তালিকায় নেই। উল্লেখ করা হয়নি দারিদ্র্য ও দীর্ঘকালীন অসুস্থতার কারণে ক্রনিক অপুষ্টিজনিত সমস্যার কথা। আবার যাঁদের অধিক ওজন বইতে হয় বা বেশি ভারী কাজ করতে হয় তাঁরাও ক্রমে দীর্ঘস্থায়ী অস্থি ও স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া অসুরক্ষিতভাবে কাজ করার জন্য নানারকম পেশাগত ব্যাধি তো আছেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয় অনিশ্চিত আয়, উচ্ছেদের আশঙ্কা, জরুরি পরিষেবার অপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে মানসিক চাপ ও তার শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া, মানসিক ব্যাধি ও নেশাগ্রস্ততা ইত্যাদি। অতএব এইসব স্থায়ী অসুখ থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হল বস্তিগুলিতে সাধারণ মৌলিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করে রোগের উৎসগুলিকে যতটা সম্ভব বন্ধ করা, রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সুবন্দোবস্ত করা, যার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রসাশনিক পরিবেশ।

সব কিছু মিলিয়ে একসঙ্গে

শহরের সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের কী সম্পর্ক তা পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করে দেখিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউ.এন-হ্যাবিট্যাট তাদের যুগ্ম প্রতিবেদনে (২০১০)। এর মধ্যে বস্তি নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রথম পর্যায়ে। অন্য চারটি প্রধানত আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক। এই পাঁচটি পর্যায় হল যথাক্রমে—

১. প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ: বন্যাপ্রবণ নদ, নদী বা সমুদ্রের তীর, পাহাড়ের ঢাল, মরুভূমির নিকটবর্তী স্থান ইত্যাদি

প্রতিকূল পরিবেশ ও চরম আবহাওয়ায় বা দূষণকারী শিল্পকারখানা, সড়কের পাশে বসবাসের প্রভাব পড়ে জনস্বাস্থ্যে। এছাড়া বাসস্থানের গঠন ও গুণগত মান, জলসবরাহ, শৌচালয় ও পয়োপ্রণালি ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, বায়ুদূষনের পরিমাণ ও অন্যন্য নগর পরিকাঠামোরও প্রভাব রয়েছে জনস্বাস্থ্যের ওপর।

২. আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি: স্বাক্ষরতা/শিক্ষা ও উপার্জনের সুযোগ, সামাজিক সহায়তা, সমঝোতা ও সংহতি, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদির উপস্থিতি/অনুপস্থিতি জনস্বাস্থ্যে বড়োরকমের দীর্ঘমায়াদি প্রভাব রাখে। নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য বস্তিবাসীদের মূল নাগরিক সমাজ থেকে ব্রাত্য করে দেয়। বিপরীতে সঠিক সামাজিক সহায়তায় দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা বিস্তারের সরকারি/অসরকারি কার্যক্রমগুলি সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছালে সামাজিক ব্রাত্যকরণ রুখে যেতে পারে, গড়ে উঠতে পারে যথাযথ মানব সম্পদ। এমন জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীন বোঝাপড়া সুসংহত হলে জনবল তৈরি হয়, সৃষ্টি হয় সামাজিক মূলধন। এই সামূহিক শক্তিকে তাঁরা স্বার্থান্বেষীদের সরিয়ে নিজেরাই স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবা এবং পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনায় সরাসরি শামিল হতে পারেন। সকলের সামাজিক নিরাপত্তা ও লিঙ্গ সমতা সমাজের দুর্বলতম অংশের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করে।

৩. খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যের মান: খরা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, সামাজিক/রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, দাঙ্গা, বিপুল অভিবাসন, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি পরিস্থিতিতে খাদ্যের মান ও পরিমাণ দুই হ্রাস পায় এবং জনস্বাস্থ্যে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। আবার অন্য সময়ে পণ্যবাদী প্রচারের চাপে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও লবণ প্রধান প্যাকেটজাত চটকদার অপুষ্টিকর বাজারি খাবারের আকর্ষণ জনস্বাস্থ্যকে বিপদগ্রস্ত করে।

৪. সাধারণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা: ঠিকমতো পানীয় জলের যোগান, ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি মৌলিক নাগরিক পরিষেবা এবং শিশু, প্রসূতিসহ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টির তত্ত্বাবধান এবং জরুরিভিত্তিক চিকিৎসা পরিষেবা সর্বজনীন হলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। পরিতাপের বিষয়, সাধারণভাবে বস্তিবাসীরা এই সুরক্ষা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত থেকে যান। উদাহরণ: ২০০২-এর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, যেখানে মুম্বাইয়ের বস্তি-বহির্ভূত শহরবাসী প্রসূতিদের ৭৪% প্রাক-জন্মদান তত্ত্বাবধানের সুবিধা পেয়েছেন সেখানে বস্তিবাসী প্রসূতিদের মাত্র ৫৫% এই সুযোগ পেয়েছেন। আবার স্বীকৃত বস্তিগুলির ৮১% শিশুরা যেখানে পূর্ণমাত্রায় ডি.টি.পি টিকা পেয়েছে সেখানে স্বীকৃতিহীন বস্তির ৬৭% শিশুর এই টিকাকরণ হয়েছে।

৫. নগর কর্তৃপক্ষের সুশাসন: উপরোক্ত চারটি পর্যায়েই জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাবকে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। সুপ্রশাসন সর্বস্তরে সরকারি কার্যক্রম, মৌলিক নাগরিক পরিষেবা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে পারে। তাছাড়া মেধা ও দক্ষতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করলে তাঁরাও নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সমর্থ হতেন। তবে বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির চাপকে কাটিয়ে কর্পোরেট শক্তিকে বশে রেখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কতদূর কী করতে পারবেন তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। বিশেষত যখন ইউ.এন.হ্যাবিট্যাট-এর ২০০৩-এ বস্তি বিষয়ক রিপোর্ট তৈরির সময় গবেষকদের ওপর আই.এম.এফ ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফে যথেষ্ট চাপ ছিল যেন বিশ্বের বস্তি সমস্যার কারণ হিসেবে বিশ্বায়ন ও অসাম্যকে না দেখিয়ে কেবল মন্দ প্রশাসনকেই দায়ী করা হয় (মাইক ডেভিস, ২০০৪)।

দরিদ্র গ্রামবাসীদের মতোই বস্তিবাসীদেরও স্বাস্থ্য সমস্যার মূলে রয়েছে প্রধানত যথোপযুক্ত পরিষেবা ও পরিকাঠামো (নিরাপদ পানীয় জল, শৌচালয়, পয়োপ্রণালী, পরিবহণ) এবং পাকাপোক্ত বাসার অভাবজনিত কারণ। কিন্তু সেইসঙ্গে পথ দুর্ঘটনা, বায়ু দূষণ, বাজারি খাবার, অতিরিক্ত খরচ, মানসিক চাপ ইত্যাদি শহুরে কারণগুলিও যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। আর এইসব কারণগুলি দূর করতে হলে বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রশাসনের উন্নতি অত্যাবশ্যক। সব মিলিয়ে বলা যায়, বস্তিবাসীদের স্বাস্থ্য সমস্যা হল নগর-দারিদ্র্য, সামাজিক প্রান্তীকরণ, ভ্রান্ত সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা, ত্রুটিপূর্ণ প্রসাশন এবং বিশ্বায়িত বাজারি ব্যবস্থার এরকম স্থানিক প্রকাশ। তা হলে দরিদ্রতম শহরবাসীদের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে বস্তি কি এক অনিবার্য উপস্থিতি না কি বস্তিবাসীদের জীবনের মান উন্নত করে বস্তিহীন শহর গড়ে তোলা সম্ভব ?

নগরায়ণ বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় বস্তিবাসীদের যথাসম্ভব স্থানান্তরিত না করে এবং ঝুপড়িবাসীদের যথা সম্ভব কম দূরে স্থানান্তরিত করে মূলত পরিকাঠামোর উন্নতি ও পরিষেবাগুলি সুনিশ্চিতির মাধ্যমে যথার্থ নগর-প্রতিবেশ গড়ে তোমা সম্ভব। তবে এসব কিছুর মধ্যে কিছুর মধ্যে বাসার স্বত্বপ্রদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাসার স্বত্ব থাকলে তার স্থায়িত্ব আসে, শৌচাগারসহ কাঠামোর উন্নতির জন্য ভরতুকি ও ঋণ পাওয়া সহজ হয়, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসহ

অন্যান্য মৌলিক পরিষেবাগুলি পাওয়ার অধিকার বর্তায়। এভাবে বস্তিও স্বীকৃতি পায়, যার ফলে পাকা নর্দমা, রাস্তা, আলোসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য বস্তিবাসীরা দাবি জানাতে পারে। এই স্বত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কিছু যোজনা ও কার্যক্রম (যেমন, 'রাজীব আবাস যোজনা', 'বেসিক আর্বান সার্ভিস ফর দি পুয়োর্স' ইত্যাদি) গ্রহণ করা হলেও গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের মতো আইনি বাধ্যতা না থাকায় এই যোজনাগুলির পুরোপুরি সফলতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের সংশয় রয়েছে। (অমিতাভ কুণ্ডু, ২০১৩)

বাসার স্বত্ব প্রদান ব্যতীত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল বস্তি এলাকার ঘনবসতি। এর ফলে একদিকে যেমন রোগজীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে তেমনি এর একটি ইতিবাচক দিক হল স্বাস্থ্য ও অন্যান্য পরিষেবাকে খুব দ্রুত সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন সরকারি সদিচ্ছা ও উদ্যোগ। তাই মনে হয়, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এম.ডি.জি-র) সকল অভীষ্ট পূরণ না হলে হয়তো বস্তিবাসীদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে মুক্তি নেই। বাস্তবে সারা পৃথিবীতে এম.ডি.জি-র সাফল্য আংশিক হওয়ায় ইউ.এন ২০৩০-এর মধ্যে সকলের জন্য সুস্থায়ী উন্নয়নের (সাস্টেনেব্‌ল ডেভেলপমেন্ট গোল্‌স বা এস.ডি.জি) নতুন ১৭টি লক্ষ্য ঘোষণা করেছে এবং ভারত এতে স্বাক্ষরও দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, তাতে বস্তিবাসী ও ঝুপড়িবাসীদের জীবনে ভরসা কতটা বেড়েছে ?

তথ্যসূত্র:

১. 'Our cities, our health, our future: Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health' from the Knowledge Network on Urban Settings Acting on social determinants for health equity in urban settings, World Health Organization 2008.

২. 'State of World's Cities Report: Bridging the Urban Divide, Overview and Key Findings', United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010.

৩. United Nations Human Settlements Programme—'The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003', UN-HABITAT.

৪. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, National Building Organization, Govt. of India—'Report of the Committee on Slum Statistics/Census' 2008.

৫. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, National Building Organization, Govt. of India—'Slums in India: A Statistical Compendium 2011.

৬. Ministry of Urban Development, Govt. of India—'Handbook of Urban Statistics', 2016.

৭. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, National Building Organization, Govt. of India,--'State of Slums in India: A Statistical Compendium 2013'.

৮. Gautam Bhan, Arindam Jana—'Of Slums or Poverty: Notes of Caution from Census 2011', Economic & Political Weekly, May4, 2013 Vol. xlvii no. 18.

৯. Alon Unger and Lee W. Riley—'Slum Health: From Understanding to Action', Published online 2007 Oct 23, Journals.plos.org/plosmedicine.

১০. Lee W. Riley, Albert I Ko, Alon Unger and Mitermayer G Reis—'Slum health: Diseases of neglected populations', 07 March 2007, BMC International Health and Human Rights, BMC series, BioMed Central Ltd.

১১. 'Hidden cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings', World Health Organization. The WHO Centre For Health Development, Kobe, and United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), 2010.

১২. Mike Davis—'Planet of Slums', New Left Review, 26 March-April 2004.

Kapadia Kundu N, Kanitkar T,--'Primary healthcare in urban slums', Economic and Political Weekly, 21 December 2002.

১৩. Neha Madhiwalla, 'Healthcare In Slums In India', The National Medical Journal Of India, Vol. 20, No.3, 2007.

১৪. Kundu, Amitabh—'Making Indian Cities Slum—Free: Vision and Operationalisation', Economic & Political Weekly, April 27,2013. স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক সমাজ গবেষক, একটি নগরোন্নয়সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আর্থ-সামাজিকপরিকল্পনাবিদ্‌

এ বিশ্ব কি এ শিশুর?

ডা. কৌশিক দত্ত

মানুষের জীবন বড়ো সস্তা এদেশে, বলা ভালো তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে। খাদ্যের তুলনায় উদরের, কর্মের তুলনায় হাতের সংখ্যা বেশি হলে যেমন হবার কথা, ঠিক তাই। মানবিক অনুভূতিসমূহেরও মৃত্যুযুগ এই শতাব্দী। মৃত শিশুমুখ তবু রক্ত ঝরায় হৃদয়ের শেষ জীবিত প্রকোষ্ঠে, যেখানে শিকড় ছিল মাতৃত্ব-পিতৃত্ব নামক কিছু আদিম স্নেহের। হঠাৎ একদিন সকালের কাগজ যদি আপনার চায়ের কাপ ঠোঁটে ছোঁয়ানো মুখে ছুঁড়ে মারে সাগরবেলায় আয়লান কুর্দি অথবা হাসপাতালে বাতাস খুঁজে না পাওয়া এক-দুই-তিন-তেষট্টি অতিক্ষুদ্র শব, তবে হয়তো শেয়ার বাজারের হিসেব বা মেসি-রোনাল্ডো-কোহলি দেখতে ভুল হয়ে যেতে পারে। প্রজাতি হিসেবে সম্পূর্ণ মরে যেতে মানুষের আরও দু-শ বছর লাগবে, বিজ্ঞানীরা বলেছেন। ততদিন আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আর বিপন্ন বোধ করব তাদের ধ্বংস হতে দেখলে। শিশুমৃত্যু আসলে নিজের ভবিষ্যতের মরে যাওয়া। তা দেখে কেঁদে ওঠা আসলে নিজের সমূহ অবলুপ্তির ভয়ে কাতরতা।

শিশুদের বাঁচাতে চাওয়ার আবেগ বস্তুত প্রজাতির উদ্বর্তনের এক প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত। জীববিজ্ঞানের নিরিখে আবেগমাত্রই বেঁচে থাকার মৌল তাগিদের এক প্রতিবর্ত প্রকাশ আসলে। শিশুমৃত্যুজনিত আবেগের যৌক্তিক পরিণতি, অতএব, শিশুদের বাঁচানোর চেষ্টা। বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাবার চেষ্টার মধ্যে কবির প্রতিজ্ঞা থাকবে, ফেসবুকীয় বিলাপ থাকবে, ক্রোধ থাকবে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। জঞ্জাল সরানোর বাস্তবসম্মত প্রয়াস এবং ফলপ্রদ পদ্ধতির সন্ধান জরুরি।

মানবশিশু জন্মমুহূর্তে শারীরিকভাবে অন্য অনেক প্রাণীর তুলনায় দুর্বল, সময়ের আগে জন্ম নিলে তো কথাই নেই। তখন শরীরের তাপমাত্রা বা রক্তের শর্করা বজায় রাখতে ও সে হিমশিম খায়। অতঃপর নিওনেটাল টিটেনাস থেকে শুরু করে অন্ত্র, ফুসফস, রক্ত, মস্তিষ্কের নানাবিধ ব্যাধি তো আছেই। সংক্রমণজনিত রোগ ছাড়া ও জন্মগত ত্রুটি (যেমন হৃদ্‌পিণ্ডের) বা নানারকম জিনগত সমস্যা প্রাণঘাতী হতে পারে। বস্তুত জীবনের প্রথম বছরটি পার করতে না পারার সম্ভাবনা এতটাই যেকোনো এলাকার মানুষের আয়ুষ্কাল অনুমান করার জন্য “লাইফ এক্সপেক্টান্সি অ্যাট দ্য এজ অব ওয়ান” হিসেব করা হয়।

স্পষ্টতই শিশুদের প্রয়োজন বিশেষ সুরক্ষা। হয়তো সিংহশাবকের চেয়ে কিছু বেশি যত্ন প্রয়োজন মানবশিশুর। মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শিশু সুরক্ষা সমাজের দায় ও দায়িত্ব। বর্তমান কাঠামোয় সেই সমাজ শুরু হয় পরিবার থেকে, শেষ হয় রাষ্ট্রে। বিভিন্ন অসরকারি সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকা বা প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। এর প্রতিটি পর্যায়ে সচেতনতা, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেলে এবং বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ হলে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব। বিজ্ঞানের প্রয়োগ মানে আরও দেড়লক্ষ ভেন্টিলেটর নয়, এর মানে পরিচ্ছন্নতা থেকে পুষ্টি, সর্বক্ষেত্রে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা।

মগজে গেঁথে নেওয়া প্রয়োজন, শিশুর যত্ন শুরু হয় মায়ের যত্ন থেকে, এমনকী সেই মা গর্ভবতী হবারও আগে থেকে। বস্তুত, তা শুরু হওয়া উচিত সেই মায়ের শিশুকাল থেকে বা তাঁর মায়ের থেকে। সুস্থ, শিক্ষিত ও সুখী মা সুস্থ শিশুর প্রাকশর্ত। অবশ্যই তা শিশুর সর্বাঙ্গীণ কুশলের গ্যারান্টি নয় এবং শিশুর সুস্থতার দায় একা মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার কোনো যুক্তি নেই, এমনকী মা যথেষ্ট যত্ন পেলেও।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে সেই পুরনো প্রবাদ, “সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়”। শিশু-শরীরে প্রায়শ দশফোঁড়ের স্থানসংকুলান হয় না, তাই অনেক দেরিতে শহরের বড়ো হাসপাতালে দৌড়ানোর চেয়ে বেশি ফলপ্রদ প্রথমাবস্থায় গ্রামীণ হাসপাতালের কড়া নাড়া।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা অর্থনীতি (অশিক্ষাকে এর অংশ হিসেবেই ধরছি)। দরিদ্রের জন্য পুষ্টি কোথায়? নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা আছে কি সর্বত্র? আছে কি প্রসব পরবর্তী সমস্যার উপযুক্ত চিকিৎসা? প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

পৌঁছানোর রাস্তা কত দীর্ঘ? সেখানে গেলেই কি পাওয়া যাবে প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু? ব্লক হাসপাতাল, কোথায় সে? শহর কত দূরে? সেখানকার গোলকধাঁধায় মন আঁধার হলে কি দেহাতী মা-বাপের হাত ধরে কেউ, নাকি দেখতে চায় শুধু আধারকার্ড?

শিশু মৃত্যু তাই চলতে থাকে। কখনো আন্ত্রিক, কখনো এনকেফালাইটিস বা ম্যালেরিয়া, কোথাও অক্সিজেনের অভাব তো কোথাও পরিশ্রুত পানীয় জলের নামই শোনেনি কেউ। উন্নয়নের সঠিক

মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, শিশুদের মৃত্যুতে সত্যি কি কেউ দুঃখিত, নাকি আরেকটি রাজনৈতিক মুদ্রা হাতে পেয়ে ভোট বাজারের ক্রেতাসাধারণ আদতে খুশি?

নীতি অবলম্বন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু বছরের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যর্থতা এর মূলে। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন সময়ে থেকেছে বিভিন্ন দলের হাতে। সঠিক দিশায় এগোতে না পারার দায় কম বেশি সকলেরই। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে বন্দুক সজ্জায় বাজেট বাড়ালে সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় যে মানুষ নয়, মানচিত্রই দেশ, অভ্যন্তর নয় সীমান্তই তার সত্তা।

দায় সামগ্রিকভাবে আমাদেরও। আমাদের রাজনীতিবোধ অতিবিচিত্র ও নেতিবাচক। আমরা আমাদের প্রশাসকদের সঠিক কাজ করতে বাধ্য করিনি, বস্তুত তার চেষ্টাই করিনি। পারস্পরিক দোষারোপের সহজ রাজনৈতিক খেলাটিতেই আমরা মেতে থেকেছি। যদি আমার দলের সরকার হয়, তাহলে এককথায় সব দায় ঝেড়ে ফেলব অথবা অকারণ তুলনা টেনে বলব, "কেরলেও তো ৪২০ জন মারা গেছিলেন", আর যদি আমি হই সরকার বিরোধী, তাহলে খুব খানিক গালমন্দ করে আনন্দ পাব এবং পরবর্তী নির্বাচনে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। এই রাজনীতি দেখে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, শিশুদের মৃত্যুতে সত্যি কি কেউ দুঃখিত, নাকি আরেকটি রাজনৈতিক মুদ্রা হাতে পেয়ে ভোট বাজারের ক্রেতাসাধারণ আদতে খুশি?

বহু সংখ্যক শিশুর অকালমৃত্যু অথবা অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটলে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। তদন্ত তো হবার কথা সমস্যার উৎস খুঁজে বের করে তাকে শোধরানোর জন্যে। অথচ আমরা তদন্ত বলতে বুঝি এক-দু-জন মানুষকে দোষী চিহ্নিত করে শাস্তি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা। জনতার দাবিও মূলত সেটাই। নিজেদের বাঁচানোর জন্যে অতএব সরকারি অফিসার বা কর্মচারীরা সত্য অস্বীকার করবেন, মিথ্যের জাল বুনবেন। সাম্প্রতিক গোরক্ষপুরের ঘটনার ক্ষেত্রে যেমন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদল বলে দিলেন অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু হয়নি। অথচ বলা উচিত ছিল, মৃত্যুর কারণ যাইহোক, এত বড় হাসপাতালে অক্সিজেন না থাকাটা মেনে নেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এ শহর চিরকাল নোংরা, আগেও এখানে এত বাচ্চা মরেছে। অথচ বলার কথা ছিল, যদিও এখানে আগেও শিশুমৃত্যু হয়েছে, তবু আমার সময়ে যে আবার হল, এ আমার দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতা; সংশোধনের দায়ও আমাদের। বলতে পারলেন না তাঁরা এইটুকু কথা সাহস করে। সরকারও জানে, দায় মেনে নিলেই বিরোধী পক্ষ সেটাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে। সুতরাং চলতে থাকবে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা, বাস্তবকে না দেখার চেষ্টা। সব মিলিয়ে সত্যকে স্বীকার করার, তার মুখোমুখি হবার, নিজের (বা নিজের দপ্তরের) কাজের বিশ্লেষণে সৎ হবার কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিসর নেই। সত্যভাষণকে প্রবলভাবে ডিসকারেজ করার একটা বন্দোবস্ত আমাদের সিস্টেম এবং আমাদের প্রতিরোধ, উভয়ের মধ্যেই। শাসনবলতে আমরা বুঝি ক্ষমতার আস্ফালনের দ্বারা সকলকে চুপ করিয়ে রাখা, আর আন্দোলন বলতে বুঝি কাউকে গালি দেওয়া বা পেড়ে ফেলা। গঠনমূলক প্রশাসন এবং আন্দোলনে আমাদের প্রবল অনীহা। তাই রাজা বদল হয়, বদলায় না গভর্নেন্স।

বিক্রমাদিত্যকে বেতাল শুনিয়েছিল এক বালকের গল্প, যার দরিদ্র বাবা-মা তাকে বিক্রি করে দিয়েছিল রাজার কাছে, আর তান্ত্রিকের পরামর্শে রাজা তাকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে ছেলেটি একবার কেঁদেছিল আর একবার হেসেছিল। কেন তার এই হাসি-কান্না? বিক্রমাদিত্য বলেছিলেন জন্মের পর সন্তানকে রক্ষা করেন পিতা-মাতা, অথচ তাঁরা অর্থের লোভে সন্তানকে বিক্রি করে দিলেন! এই দুঃখে ছেলেটি কেঁদেছিল। সকলে বিরূপ বা ব্যর্থ হলে প্রজা যায় রাজার শরণে, আর সেই রাজাই কিনা নিজস্বার্থে অসহায় বালক প্রজাকে বলি দিতে চলেছেন! এই প্রহসন দেখে সে হেসেছিল। আমাদের শিশুরা ও বুঝি আমাদের কাজকর্ম দেখে অবাক হয়ে দেয়ালা করে। গর্ভস্থ কন্যাভ্রূণকে হত্যা করাচ্ছেন বাবা, ডাস্টবিনে কুকুরের মুখে অসুস্থ সন্তানকে ফেলে দিচ্ছেন মা, নিতান্ত কেজো ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে রণে ভঙ্গ দিচ্ছেন বৈদ্য, আশ্রয় না দিয়ে অজুহাত দিচ্ছেন রাজা, আর বিবেকের বেশধারী সমাজ শকুনির সঙ্গে বসে সদ্য মৃত শিশু-হাড় থেকে তৈরি করছে রাজনৈতিক দ্যূত ক্রিড়ার অক্ষ।

কে বাঁচাবে এই জাতিকে? কে বাঁচাবে এই প্রজাতিকে? এ বিশ্ব কি এ শিশুর বাসভূমি হবে কোনোদিন? নাকি বধ্যভূমি রংমহলে একবার কেঁদে আর ক্ষণিক হেসে বিদায় নেবে আরও তেষট্টি হাজার . . . তেষট্টি লক্ষ শিশু? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

(প্রথম প্রকাশ ওয়েব পত্রিকা ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম।)

ডা. কৌশিক দত্ত, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট।
একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

দৃষ্টিকোণ

আক্রান্ত চিকিৎসক, শূন্য বেসরকারি আউটডোর, কিছু অনিবার্য প্রশ্ন

ডা. বিষাণ বসু

চিকিৎসকদের ওপর হামলা নিয়ে কিঞ্চিৎ ছাড়াছাড়াভাবে তাঁদের আন্দোলন বিক্ষোভ চলছিলই। পরিস্থিতি অসহনীয় হওয়ায়, গত ২৬ আগস্ট, চিকিৎসকদের ওপর লাগাতার হিংসার প্রতিবাদে, ডাক্তারবাবুরা বেসরকারি হাসপাতালের আউটডোরে রোগী দেখা বন্ধ রেখেছিলেন। শহরের অধিকাংশ বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের বহির্বিভাগ সেদিন ছিল শূন্য। যদিও ইমারজেন্সি খোলাই ছিল-- কাজেই, আপতকালীন চিকিৎসা পেতে অথবা ভর্তি থাকা রোগীদের পরিষেবা পেতে কোনো অসুবিধে হয়েছে এমন খবর নেই। কিন্তু, দূরদূরান্ত থেকে চিকিৎসার আশায় আসা অনেক রোগীর এবং তাঁদের পরিজনদের বিস্তর দুর্ভোগ হয়েছে বলে জানা গেল।

> ডাক্তারদের যে কাজের জায়গায় কিছু নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, এই দাবিটুকু যে ন্যায্য, সেইটা তো এই আউটডোর বন্ধের আগে পর্যন্ত, টিভি খুলে কখনো জানতেই পারিনি।

শুনে ভারি আশ্চর্য হলাম। রাজ্যজোড়া উন্নয়নের জোয়ার তো চিকিৎসাক্ষেত্রকে ছেড়ে রাখেনি। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে সেরা মানের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে শুনেছিলাম, ব্যবস্থাপনাও চমকপ্রদ-সপ্তাহের বার মিলিয়ে বিছানার চাদরের রঙ বদলানো-সেখানে, বহুমূল্য চিকিৎসাকেন্দ্রের কিছু অর্বাচীন ডাক্তারবাবু একদিন আউটডোরে রোগী না দেখতে চাইলে, লোকসান তাঁদেরই-তাইতে খামোখা মানুষের হয়রানি হবে কেন?

চিকিৎসকের প্রাণের ভয়, নাকি অকুতোভয় দুঃসাহসে রোগীর স্বার্থরক্ষা? সরকারের সাফল্যের ঢাকপেটানো দাবি, নাকি পাশাপাশি প্রচ্ছন্ন হুমকি? অথবা, প্রশাসনিক সুখনিদ্রা, নাকি দুর্বৃত্তদের হালকা প্রশ্রয়, বরাভয়? সংবাদমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট খবর, নাকি তা নিছকই রোগীর পক্ষের সত্য সম্প্রচার? আসলে কে কী চাইছেন? কোন দলে কখন যাব? এমনিতেই কেমন একটা কনফিউজড থাকি, আর এখন তো আমাদের মতো পুরোনো চিন্তাভাবনা নিয়ে চলা মানুষজনের পক্ষে সময়টা অনুধাবন করা অসম্ভব জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খুব গুছিয়ে হয়তো পারব না, তবু, অগোছালো করেই, সমস্যাটি বোঝার চেষ্টা করি। প্রথমেই পরিষ্কার করে নিই, বর্তমান লেখকের সরল বিশ্বাস, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চিকিৎসক নিগ্রহ একটি সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা শুধুমাত্র এই রাজ্য বা এই দেশে সীমিত নয়। কাজেই, চটজলদি সমাধান আমরা এখানেই খুঁজে পাব, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। একথার মানে এই নয় যে, চিকিৎসার জায়গায় ডাক্তারবাবুদের নিরাপত্তার সাধারণ বা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে আশা, সেই বিষয়ে বর্তমান প্রশাসনের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। দেশের জনগণের নৈতিক চরিত্রের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটলে সমাজে চুরি-ডাকাতি-অপরাধ হয়তো কমবে-কিন্তু, উজ্জ্বল সেই ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় পুলিশ হাত গুটিয়ে থাকলে তা ভারী চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খোঁজার সময় আক্রমণ বা হিংসা বহাল থাকলে, স্বপ্নের সেই সমাধানের দিনে, চিকিৎসা করার জন্য যথেষ্টসংখ্যক ডাক্তার এই পেশায় থাকবেন তো?

খুব পরিকল্পিতভাবে, দীর্ঘ কয়েকদশক ধরে, চিকিৎসাব্যবস্থাকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলা হয়েছে—Dehumanized Healthcare-এর আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। এতবছর ধরে লালন করা সেই বিষবৃক্ষে অবশেষে ফল ধরতে শুরু করেছে-এতে আশ্চর্যের কিছু তো দেখি না। সারা পৃথিবী জুড়েই, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যকর্মীরা শারীরিক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। দেশবিদেশের বিভিন্ন জার্নালে এই নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ

> ডাক্তার আর রোগী-পরিজন যুযুধান হয়ে থাকলে বাকি সবারই সুবিধে। অসুবিধে শুধু দুইপক্ষের। আপনাদের, অর্থাৎ রোগী এবং তাঁর পরিজনের। আর, আমাদের, মানে ডাক্তারদের।

করা হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। মার্কিনদেশে অল্পবয়সীদের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার উৎসাহ ক্রমহ্রাসমান, অন্যান্য পশ্চিমীদেশেও ছবিটা আলাদা নয়। এসব সত্ত্বেও, আক্রমণের ঘটনা বদলাচ্ছে না। কবির সুরে সুর মিলিয়ে, আমাদের রাজ্যটি, অন্তত এই ব্যাপারে সকল দেশের সেরা হয়ে ওঠার দাবি রাখে। গত কয়েক মাসে এই রাজ্যে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে চল্লিশজনেরও বেশি চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। অনেকসময়েই নিজেদের রুচি বা শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে, আক্রমণকারীরা আশ্চর্য অভিনব লাঞ্ছনাপদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন--যেমন চিকিৎসকের গায়ে বিষ্ঠালেপন ইত্যাদি। চিকিৎসায় খুশি না হয়ে রোগীর পরিজনেরাই এই আক্রমণ চালিয়েছেন বলে সন্দেহ হলেও, পরবর্তীকালে দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হামলাকারীদের রোগীর পরিজনেরা চেনেনও না। হ্যাঁ, এখনও রাজ্যজোড়া সবাই একটি বিশেষ সংবাদপত্র পড়েন না বলে এই রাজ্যকে, সামগ্রিকভাবেই, একটু "পিছিয়ে পড়তে" হয়েছে, অন্য রাজ্যের মতো এই ধরনের আক্রমণে কোনো চিকিৎসক এখনও একেবারে খুন হয়ে যাননি--তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ এবং প্রশাসন যেমন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকছেন, সেই প্রশাসনিক সদিচ্ছের সুফল আমরা নিশ্চয়ই পাব সে আশা করাই যায়।

এই লাগাতার আক্রমণের প্রতিবাদে, নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগে, কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম নিরাপত্তার দাবিতে ডাক্তারবাবুরা বিক্ষোভে শামিল হলে বা মাত্র একদিন আউটডোরে রোগী দেখা বন্ধ রাখলে মানুষের হয়রানির কথাটিই উঠে আসে সামনের পাতায়, সমস্যাটা চলে যায় আড়ালেই। কিন্তু, ডেবরার যে সরকারি ডাক্তারের গায়ে সেদিন বিষ্ঠা মাখানো হল, সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি অন্য কেউ চিকিৎসার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন না? তাঁদের কি চিকিৎসায় দেরি হয়নি? যেখানে নার্সের জামা ছিঁড়ে নেওয়া হল, ব্যাহত হয়নি সেখানকার রোগীদের দেখাশোনা? কর্মরত যে ডাক্তারদের ওপর শারীরিক আক্রমণ হয়েছিল, সেখানেও তো অপেক্ষা করছিলেন আরও অনেক রোগী, তাঁদের পরিজন--মারের ঠেলায় ডাক্তার নিজেই হাসপাতালে ভর্তি হলে, অপেক্ষারত সেই তাঁদের হয়রানি হয়েছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো খবর তো এখনও দেখলাম না! কোনো মিডিয়ার তরফে অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের জোরালো দাবি হয়েছে? না, এমনটাও চোখে পড়েনি।

চিকিৎসকদের ক্ষোভ একদিনের নয়। মৌখিক আক্রমণ তাঁরা অনেকদিন ধরেই সহ্য করছেন, কিন্তু ইদানিং শারীরিক লাঞ্ছনার ঘটনা বেড়েছে বহুগুণ। বিক্ষোভ-আন্দোলন থেকে ডাক্তারেরা সচরাচর গা বাঁচিয়ে চলতেই পছন্দ করেন--কিন্তু, এখন, বোধহয়, সেই বিলাসিতার সুযোগ আর নেই। তাই, ডাক্তারবাবুরা পথে নেমেছেন, আন্দোলনের এই ধাপে বহির্বিভাগে রোগী দেখা বন্ধ রেখেছেন, একদিনের জন্যে। টেলিভিশনে দেখলাম, একটি চ্যানেল প্রশ্ন করছেন, এইভাবে, রোগী না দেখে কি সমস্যার সমাধান হবে? না, হবে না। সেটা ডাক্তাররাও জানেন। একদিন বহির্বিভাগে রোগী দেখা বন্ধ রাখলে সব হিংসা থেমে যাবে, এতখানি বাস্তব-বুদ্ধির অভাব তাঁদের নেই। কিন্তু আপনারাই বলুন, চিকিৎসার জায়গায় শান্তি বা নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখার সাধারণ যে কর্তব্য পুলিশ-প্রশাসনের থাকে, সে দায়িত্বপালনে তাঁরা ব্যর্থ হলে, বা একেবারেই সে চেষ্টা না করলে, তাঁদের সেই ঘুম ভাঙানোর অন্য পথ কোথায়? দোষীদের জরুরি ভিত্তিতে গ্রেফতার, বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, কোনোটারই উদ্যোগ প্রশাসনিকস্তরে চোখে পড়ছে না।

আরেকটি চ্যানেলে শিরোনাম, ন্যায্য দাবি, অন্যায্য ধর্মঘট। প্রথমত, ২৬ আগস্ট চিকিৎসকেরা কোনো ধর্মঘট করেননি, জরুরি পরিষেবা ছিলো অব্যাহত। আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, এমারজেন্সি খোলা ছিল। ভর্তি ছিলেন যাঁরা, তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা কোনোভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, এমন খবর পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, ডাক্তারদের যে কাজের জায়গায় কিছু নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, এই দাবিটুকু যে ন্যায্য, সেইটা তো এই আউটডোর বন্ধের আগে পর্যন্ত, টিভি খুলে কখনো জানতেই পারিনি। জেনে ভালো লাগল যে, অন্তত দেরিতে

> নৈর্ব্যক্তিক যে চিকিৎসা আমরা পশ্চিম থেকে আমদানি করেছি, তার কুফল সেই আমাদের, অর্থাৎ ডাক্তারদেরই পোয়াতে হবে--কেননা, সেই আমদানির ক্ষীরটুকু যাঁরা খাচ্ছেন, কর্পোরেট বা বহুজাতিক সংস্থার সেইসব মালিকের মুখ সাধারণের আড়ালেই থাকে।

হলেও, কর্মক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার দাবিকে সবাই ন্যায্য বলে মেনে নিচ্ছেন। মেনেই নিয়েছি যে, সমস্যার গভীরে পৌঁছানো বা তার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের দিকপ্রদর্শনের দায়বদ্ধতা ঘোলাটে সাংবাদিকতা বা অগভীর চিন্তনে অভ্যস্ত এই সময়ের কাছে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু, যাঁরা বলছেন, এই পথে সমস্যার সমাধান নেই, তাঁদের সাথে সম্পূর্ণ সহমত হয়েই অনুরোধ করছি পথটা খুঁজে বের করতে। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মনে করিয়ে দিই সেই দৃশ্য, কোনো একটি বিশেষ আন্দোলনের ঘটনা সম্প্রচার করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের বন্ধুরা শাসকদল এবং পুলিশের প্রায় যৌথ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন--প্রতিবাদে তাঁরা একেবারেই রাস্তায় বসে পড়েছিলেন, মারমুখী পুলিশ সেখানেও তেড়ে এসে তাঁদের তুলে দেয়। সেদিক থেকে দেখলে লাগাতার মার খেয়ে, গালাগালি শুনে, প্রশাসনের অনেকদিনের নিষ্ক্রিয়তা দেখে আমরা যেটুকু প্রতিবাদ করেছি--চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট মহলে আবেদন-নিবেদনের কোনো উপযুক্ত উত্তর না পেয়ে--সেটাকে কি কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই বাড়াবাড়ি বলা যায়? হ্যাঁ, জানি, অনেকে

হয়তো বিশ্বাস করেন যে, সন্ধেবেলা "ঘণ্টাখানেক" টিভির পর্দায় বক্তব্য পেশ করেই দেশে বিপ্লব এনে ফেলা সম্ভব--কিন্তু, স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতার কারণে সেই সান্ধ্য কলকাকলিতে আমার যদি আস্থা না থাকে, তাহলে?

আমি নিজে ডাক্তার। অর্থাৎ যেখানে যা যা অবিচার ঘটছে, তার জন্য জমা রাগ আমার ওপর উগরে দেওয়াই যায়, সেটা স্বতঃসিদ্ধ। এরকম বলির পাঁঠা হওয়া সত্ত্বেও, এটুকু কাণ্ডজ্ঞান এমনকী আমারও আছে যে নিরপেক্ষ খবর--বলে কিছু হয় না, সেটা জানি। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ যেখানে ওঠে, সেখানে বাস্তবটা কী, তার বিচার সময়সাপেক্ষ। হতে পারে ডাক্তারের অবহেলা; অন্যদিকে হতে পারে, ডাক্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও রোগীর মৃত্যু, এবং প্রিয়জনের অপ্রত্যাশিত বিয়োগে পরিজনের হতাশা। অনেক সময় ধরে, সবার কথা শুনে, তারপর সেই খবর শোনানোর সুযোগ হয়তো সাংবাদিককুলের ইদানিং হয় না। কাজেই সাংবাদিকেরা, ডাক্তারের দোষ, এটাকেই প্রাথমিক সত্যি ধরে খবর পরিবেশন করবেন, তাতেও তেমন আপত্তি করি না। কিন্তু, ঠিক কোনখানে সংবাদ পরিবেশনের ভাষা হিংসায় উসকানি হয়ে যাচ্ছে, কোথায় রোগীর পক্ষ নেওয়ার প্রয়াস গুন্ডা-সমাজবিরোধীদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে পর্যবসিত হচ্ছে, সেটা, সাংবাদিকবন্ধুরাও একটু ভেবে দেখবেন--আত্মসমীক্ষা তো সব পেশার মানুষেরই অবশ্যপালনীয় দায়, তাই না?

বাস্তবটা হল, মার্সিডিজ বা বাস, দুটোতেই আপনি গন্তব্যে পৌঁছোবেন—তফাতটা শুধু আরামের। ব্যয়বহুল মাত্রেই সেরা বা সেরা মাত্রই চূড়ান্ত ব্যয়বহুল—চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই কথাটি, অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।

ডাক্তারবাবুরা আউটডোরে, একদিনের জন্যে হলেও, রোগী দেখা বন্ধ রাখায় প্রত্যাশামতোই সরকারি স্বাস্থ্যকর্তারা একেবারে ফোঁস করে উঠেছেন। স্বাভাবিক। কোনো রাজনৈতিক ব্যানার ছাড়াই চিকিৎসকেরা জোট বাঁধছেন। চিন্তার বিষয় বই কী। যদিও অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় বলে বিশ্বাস করা মুশকিল, কিন্তু, যে রাজ্যে, রাজনীতি মানেই দলের লেজুড় হয়ে অন্ধ আনুগত্যের লেজ-নাড়ানোর বাইরে ভাবা যায় না, সেখানে অ-রাজনৈতিকদল ছাড়া পথ কী? সরকারবাহাদুর সরকারি ব্যবস্থায় জড়িত থাকা বেশির ভাগ চিকিৎসককে কু-দেখিব-না-কু-শুনিব-না-কু-কহিব-না-র প্রাণীতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন, এই অবস্থায় বেশ কিছু ডাক্তার সরব হলে সরকারের ভারি বিড়ম্বনা। বিশেষত, বিড়ম্বনার বিষয়ের যেখানে কমতি নেই। জনস্বাস্থ্যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদি অবহেলায় রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেহাল। বাহারি কার্পেটের নীচে দগদগে ঘা চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনস্বাস্থ্য অবহেলিত, প্রাথমিক স্বাস্থ্যও তাই। অতএব, জেলা হাসপাতাল থেকে মেডক্যাল কলেজ, রোগীর চাপে জর্জরিত। যত্ন নিয়ে রোগী দেখে চিকিৎসাটুকুই দুঃসাধ্য, সময় নিয়ে পরিজনের সাথে আলোচনা প্রায় অসম্ভব। কাজেই, যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁরা অনেকদিন যাবৎ সরকারি হাসপাতাল থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। ছোটোবড়ো নেতারাও, নেহাত বিচারাধীন বন্দি না হলে, সরকারি হাসপাতালমুখী হন না। সরকার নিজেও বোধহয় সরকারি ডাক্তারবাবুদের ওপর আস্থা হারিয়েছেন, কাজেই সরকারি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটিতে বেসরকারি ডাক্তারবাবুদের ভিড়।

গত দুই-তিন দশক ধরেই, দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেসরকারি-কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার মহান দায়িত্বটি যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এরাজ্যও ব্যতিক্রম হবে কোন দুঃখে? এমতাবস্থায় যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁদের পাশাপাশি, দুঃস্থ-দরিদ্র মানুষের একটি বড়ো অংশ প্রায় জমিজায়গা ঘটিবাটি বেচে বেসরকারি হাসপাতালের শরণাপন্ন হচ্ছেন। আর বেসরকারি পুঁজির সামনে মানুষের অসহায়তা বেশি মুনাফার সুযোগমাত্র। বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমর্থকরা অনেকেই বলে থাকেন, পশ্চিমী দেশের তুলনায় আমাদের দেশে সমমানের চিকিৎসার ব্যয় নামমাত্র। কথাটা অর্ধসত্য মাত্র। বাস্তবটা হল, আমাদের মুদ্রামান এবং গড় আয়ের প্রেক্ষিতে এই ব্যয় আকাশছোঁয়া। কর্পোরেট পুঁজির এই অবাধ চারণক্ষেত্রে চিকিৎসা পণ্যমাত্র--আইনও সেই স্বীকৃতি দিয়েছে--চিকিৎসার বিচার হয় ক্রেতা-আদালতে। আরেকদিকে, যাঁদের সামর্থ্য নেই, তাঁরা যখন সরকারি হাসপাতালে যাচ্ছেন, তাঁদের সেই যাওয়াও অপারগের শ্রদ্ধাহীন যাওয়া। প্রায় ঘড়ির কাঁটার নিপুণতায় চলা বিপুল এই যান্ত্রিক চক্রব্যূহে, রোগী অথবা পরিজনের সামনে হাজির যে একমাত্র মানুষটি তিনি ডাক্তার। এবং তাঁর সঙ্গে থাকা নার্স ইত্যাদি কয়েকজন মানুষ, যাঁদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা কম বলে দায়ভার কম, কিন্তু সবসময় রোগীর সামনে থাকতে হয় বলে যাঁরা সহজে সমালোচিত। স্বভাবতই, কারণে বা অকারণে, রাগে বা দুঃখে, যখনই দাঁতনখ বেড়িয়ে আসছে শিকার-হওয়া-শিকারির কিংবা সহজে-পপুলারিটি-শিকারির, তার আক্রমণের লক্ষ্য সেই ডাক্তারবাবুই, সঙ্গে আর গুটিকয় রক্ষাকর্তাহীন নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী।

ক্ষোভের জায়গাটা একদিনে তৈরি হয়নি। এই পরিস্থিতি এবং তার কারণগুলি সরকারবাহাদুর জানতেন না এমনও নয়। তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের কথা ভাবেননি, অথবা বলা ভালো, ভাবতে চাননি। এখন এই ক্ষোভ নিরসনের জন্য তাঁরা গোড়ার সমস্যার প্রতিকারে আগার পরিচর্যায় বসেছেন। এমন একটি আইনের ব্যবস্থা করেছেন, যার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা শুধু প্রবল নয়, একেবারে অবশ্যম্ভাবী। আর, আইন প্রণয়নের সুরটি এমনই চড়া তারে বাঁধা যে, আইন লাগু

হওয়ামাত্রই, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডাক্তারদের ওপর আক্রমণের সংখ্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ।

এই পরিস্থিতিতে, বিশেষত প্রশাসনের শীতঘুম ভাঙাতে, ডাক্তারবাবুদের সামনে হয়তো জোট বাঁধা ছাড়া তেমন আর কোনো পথও ছিল না। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে, সাংবাদিকবন্ধুদেরও বোধহয় তাই। তাঁরা বেসরকারি পুঁজির অধীনে চাকরি করেন মাত্র। কাজেই, সমস্যার উৎসমুখ সত্যি সত্যি খুঁজতে গেলে তাঁদের মালিকদের বা বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বার্থের বিপক্ষে যেতে হয়, কখনো-বা সরাসরি মালিকদের বিপক্ষেই বলতে হয় কথা। চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ার সম্ভাবনা, এই বাজারে অত ঝুঁকি নেওয়া মুশকিল। তার চাইতে, ক্ষোভের অভিমুখটি ডাক্তারদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া নিরাপদ, টিআরপি-দেবতার কৃপা ও বিজ্ঞাপনদাতার পিঠচাপড়ানিও তাতেই মেলে, মালিকও খুশি। সরকারেরও সেটাই সুবিধে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঢেলে সাজানো অনেক পরিশ্রমের কাজ। সত্যিকারের ঢেলে সাজাতে গেলে বেসরকারি-কর্পোরেট প্রভুরা চটে যাবেন, সেইটা বড়ো ভয়। তার চাইতে পাঁচটা মেলামোচ্ছব করলে ঝামেলা কম, হইচই বা আর্থিক লাভ দুটোই বেশি-- সম্ভবত, ভোটও বেশি। স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে, সরকার বা সংবাদমাধ্যম, কারোরই, বিশেষ অসুবিধে নেই।

এমতাবস্থায়, ডাক্তার আর রোগী-পরিজন যুযুধান হয়ে থাকলে বাকি সবারই সুবিধে। অসুবিধে শুধু দুইপক্ষের। আপনাদের, অর্থাৎ রোগী এবং তাঁর পরিজনের। আর, আমাদের, মানে ডাক্তারদের। ডাক্তারবাবুদের পিঠ, বোধহয়, একেবারে দেওয়ালে এসে ঠেকেছে। জোটবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেই বলি, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা উপসর্গের চিকিৎসামাত্র। সমস্যার গভীরে না গেলে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান মিলবে না।

মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "Among the delusions which at different periods have afflicted mankind, perhaps the greatest-certainly the least creditable—is modern economics based on the idea that an advantageous code of action may be determined irrespectively of the influence of social affection" (The Roots of Truth). এখানে শুধু Economics শব্দটি বদলে Healthcare করে নিন, তাহলেই পুরোটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেশের আর্থসামাজিক বাস্তব, রোগীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো তোয়াক্কা না করে প্রায় নৈর্ব্যক্তিক যে চিকিৎসা আমরা পশ্চিম থেকে আমদানি করেছি, তার কুফল সেই আমাদের, অর্থাৎ ডাক্তারদেরই পোয়াতে হবে--কেননা, সেই আমদানির ক্ষীরটুকু যাঁরা খাচ্ছেন, কর্পোরেট বা বহুজাতিক সংস্থার সেইসব মালিকের মুখ সাধারণের আড়ালেই থাকে। অন্যান্য সব বিষয়ের সাথে চিকিৎসাকে গুলিয়ে ফেললে হবে না--এই একটি ক্ষেত্রে মানুষের অসহায়তা এবং প্রায় মরিয়া প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিচারের দাবি রাখে। সত্যি বলতে কি, একথা অনেক আগে বুঝেছিলেন কর্পোরেট লগ্নিকারীরা। আর পাঁচটা পরিষেবা বা সামগ্রীর সাথে চিকিৎসার বিপণনের ভাষার ফারাকটুকু লক্ষ্য করুন--ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অন্যান্য সব পেশার সাথে চিকিৎসা যে একটু হলেও আলাদা--আর কিছু না হোক, শুধুমাত্র পরিষেবা-গ্রহীতার অসহায়তার কারণেই--চিকিৎসকেরা একথা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে শুরু করবেন, ডাক্তার বা রোগী, দু-পক্ষেরই তত মঙ্গল। কাজের জায়গা থেকে বাড়ি পৌঁছোতে গেলে, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ বাসেই আসেন, মার্সিডিজের আশা করেন না। কিন্তু, সেই মানুষটিই অসুস্থ হলে, সর্বস্বান্ত হয়েও, সবচেয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসার পিছনে দৌড়োন। কিন্তু, বাস্তবটা হল, মার্সিডিজ বা বাস, দুটোতেই আপনি গন্তব্যে পৌঁছোবেন--তফাতটা শুধু আরামের। ব্যয়বহুল মাত্রেই সেরা বা সেরা মাত্রই চূড়ান্ত ব্যয়বহুল--চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই কথাটি, অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এই সত্যিটুকু, আমরা ডাক্তাররা কি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব? অথবা, বলা ভালো, সবার আগে, Evidence-Based Medicine এর নামে, বহুজাতিক ওষুধকোম্পানির লাগাতার বিজ্ঞাপনের মায়াজাল এড়িয়ে, এই সত্যিটা কি আমরা ডাক্তাররা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করব?

পাশাপাশি, হিপোক্রেটিক ওথ বা ঐ ধরনের উচ্চমার্গের কথাবার্তা ছেড়ে দিলেও, মেডক্যাল এথিক্সের বিষয়ে, আমরা কি একটু বেশি সচেতন হতে পারি? কাকের মাংস কাকে না খেলেও ডাক্তারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদটা ডাক্তারদের মধ্যে থেকেই আসতে হবে। রোগনির্ণয় বা চিকিৎসার লাগামছাড়া দামের বিরুদ্ধে চিকিৎসকেরা যদি সুবিধেবাদী মৌনব্রত পালন করেন, তাহলে ডাক্তারবাবুরা কখনোই সাধারণের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবেন না। কারণে-অকারণে হেলথ চেক-আপের নামে বেসরকারি হাসপাতালের পেশেন্টসংখ্যা বৃদ্ধির আয়োজনের বিরুদ্ধে বা বিমাসংস্থার ব্যাবসা বাড়ানোর কুচক্রের বিরুদ্ধে সরব না হলে, চিকিৎসকেরা মানুষের শ্রদ্ধা পাবেন না। না, অজস্র বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির আয়োজন করলেও না। ডাক্তারবাবুরা একবার ভেবে দেখুন, এমনকী এই কঠিন সময়েও, মানুষ আমাদের বিশ্বাসই করতে চান, করেনও--সেইজন্যেই তো কর্পোরেট লগ্নিকারীরা আমাদের ব্যবহার করতে এত উদগ্রীব। আসল বিষয়টা হল, চিকিৎসা এবং চিকিৎসকের কাছ থেকে মানুষের যে প্রত্যাশা--সেইটা বোঝা। সেটুকু না হলে তো ষোলোআনাই মিছে হয়ে যায়।

পাশাপাশি, সমাজের বাকি অংশের মানুষজনেরও কিছু দায়িত্ব আছে বই কী। দ্বিপাক্ষিক কোনো সম্পর্কের সমস্ত দায়দায়িত্ব কি কোনো একপক্ষের হতে পারে নাকি? হ্যাঁ, আপনারা, যাঁরা রোগী, বা তাঁদের পরিজন--আপনারা যাঁরা ডাক্তারবাবুদের ওপর খড়্গহস্ত না হলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাক্তারেরা মজাটি টের পাচ্ছেন ভেবে অখুশি নন --সেই আপনাদেরও কিছু কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে। প্যাঁচে পড়েছেন শুধু চিকিৎসকেরা, আর আপনারা বেশ ফুরফুরে হাওয়ায়, ব্যাপারটা কি অতই সরল? আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই, বিপদও নেই তো? আজকের এই আগুনে ডাক্তারবাবুরা পুড়তে বসলে, সেই

আগুন আপনাদের স্পর্শ করবে না, এ অবাস্তব আশা আপনারা পেলেন কোথা থেকে?

আপনারা যাঁরা বলছেন, একটি মহৎ পেশার সাথে যুক্ত থেকে এরকমভাবে বিক্ষোভ-আন্দোলনে অংশ নেওয়া যায় না বা কর্মবিরতি পালন করা যায় না, তাঁদের দেওয়া সম্মানকে কুর্নিশ জানিয়ে বলি, ওই 'মহৎ পেশা' কথাটুকু বাদ রাখুন, প্লিজ। আইন কোনো পেশাকেই আলাদাভাবে মহত্বের দায় দেয়নি। আইনজ্ঞের পেশা মহৎ হলেও হতে পারে (হয়তো সেজন্যেই সে পেশার সুবিধে-অসুবিধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে বিচার্য নয়), চিকিৎসা তো কখনোই নয়। আইন জানিয়েছে, চিকিৎসা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে একটি লেনদেন মাত্র। সেখানে মহত্বের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? গাছের এবং গাছতলার ফলের সুবিধে পাওয়ার আশাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? আপনারা পছন্দমতো ডাক্তারবাবুকে কখনো মহৎ বলবেন আর কখনো ভাববেন দোকানদার-ব্যবসায়ী--এইটা একটু বেশি আবদার নয়? আরেকটা কথা জেনে রাখা ভালো। ক্রেতাসুরক্ষা আইনে এটাও স্বীকৃত যে, চিকিৎসকের বেছে নেওয়ার অধিকার আছে যে তিনি পরিষেবা কাকে বিক্রি করবেন আর কাকে নয়। কাজেই পছন্দমতো চিকিৎসা না করার অধিকারও আইনস্বীকৃত। সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুরা, সেই অধিকার প্রয়োগ করে, একদিন বহির্বিভাগে রোগী দেখতে না চাইলে সমস্যা কোথায়? আপনাকে পছন্দ না হলে ডাক্তার আপনাকে না-ই দেখতে পারেন! হ্যাঁ, সত্যিই সেই অধিকার আইনস্বীকৃত--আইনের সুরক্ষাচক্র কিন্তু শুধু আপনাদেরই ঘিরে নেই। পাশাপাশি, আপনাদের সামনে থাকবে কারণে-অকারণে আদালতে যাওয়ার সুযোগ, কিন্তু সেই হ্যাপা থেকে বাঁচতে ডাক্তারবাবুরা করিয়ে নেবেন--স্রেফ নিজেকে নিরাপদে থাকার চেষ্টা হিসেবেই—বেশ কিছু বাড়তি পরীক্ষা। এতে আপনাদের চিকিৎসার খরচ লাগামছাড়া হলে দোষ শুধু ডাক্তারের?

আর, চিকিৎসকের লোভ বা দুর্নীতি নিয়ে এত কথা বলবেন না প্লিজ। একটিবার আয়নার সামনে দাঁড়ান। সমাজের সর্বস্তরে মূল্যবোধ তলানিতে ঠেকেছে, কিন্তু সেই সামাজিক কাঠামো থেকে উঠে আসা কিছু মানুষ, স্রেফ একটি বিশেষ পেশায় আসার কারণেই, থাকবেন সৎ এবং মহৎ--আশাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? ডাক্তারবাবুদের অর্থলোভ নিয়ে আলোচনার শেষ নেই, কিন্তু যে বাজার অর্থনীতির জয়গানে আপনারা সর্বদা মুখর, সেই অর্থনীতি-ই তো শিখিয়েছে অমোঘ সেই প্রশ্ন--"If you are that good, why ain't you rich?" আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স-ই আপনার যোগ্যতা এবং সাফল্যের মাপকাঠি। পাশাপাশি চেম্বারে বসা সমান ডিগ্রিধারি দু-জন ডাক্তারবাবুর একজন এলেন অটোয় চেপে, অন্যজন মার্সিডিজে—বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনি যাবেন কার কাছে? আপনারা যাঁরা নিজের ছেলেমেয়েকে ডাক্তার বানানোর স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের ঠিক কতজন ভাবছেন যে সন্তান বড়ো হয়ে আর্তের সেবায় জীবনযাপন করবে, আর কতজন মডেল ধরেছেন স্যুটবুট পড়া বিলেতফেরত ধনী ডাক্তারবাবুকে, সেই প্রশ্নটা একবার নিজেকেই করে দেখুন, প্লিজ। সুতরাং মানুষের অসুখবিসুখ নিয়ে যাঁদের রোজকার কাজ, তাঁরা যদি ঠাটবাট রেখে চলেন, বিলাসী জীবনকেই মোক্ষ বলে ধার্য করার ভুল করে বসেন, সেই দায় কি আপনিও এড়াতে পারেন?

যাকগে, এসবই হয়তো ধান ভানতে শিবের গীত বলে মনে হচ্ছে। আসলে, সমস্যার মূলে না পৌঁছোলে সমাধান অসম্ভব। মাত্র কয়েকবছরে ডাক্তার-রোগীর শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বাসের সম্পর্ক তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, এমনটা তো নয়। ঘুণ ধরার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল আগেই, আমরা সচেতন হইনি। মূল কারণগুলো খুঁজে যদি না দেখি, পরিস্থিতি উত্তরোত্তর খারাপই হবে--সেজন্যেই না এত কথার অবতারণা।

রোগনির্ণয় বা চিকিৎসার লাগামছাড়া দামের বিরুদ্ধে চিকিৎসকেরা যদি সুবিধেবাদী মৌনব্রত পালন করেন, তাহলে ডাক্তারবাবুরা কখনোই সাধারণের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবেন না।

যে সমস্যা একদিনে তৈরি হয়নি, তার সমাধান রাতারাতি আসতে পারে না। চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা আর প্রাণের ভয় নিয়ে, আর যাই হোক, চিকিৎসা হয় না। রোগীর স্বার্থরক্ষা এবং চিকিৎসকের নিরাপত্তা--দুই-ই প্রশাসনের দায়িত্ব। বলা বাহুল্যমাত্র--সেই দায় পালনে প্রশাসন নিদারুণভাবে ব্যর্থ। কিন্তু, দোরগোড়ায় পুলিশ দাঁড় করিয়ে বিয়ে টেকে না। বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সম্পর্ক, আর যাই হোক, নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। এই হিংসা আর আক্রমণের শেষে ক্ষতি শুধু দুইপক্ষের--রোগী আর ডাক্তার। দাঁড়িপাল্লায় মাপতে গেলে, সন্দেহ হয়, ক্ষতির পাল্লাটা রোগীদের দিকেই ঝুঁকে। কাজেই, সমাধান খুঁজতে হবে দু-পক্ষকেই। প্রশাসন হয়তো সাময়িক উপশমের বন্দোবস্ত করতে পারেন, কিন্তু সেই পথে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আসবে না। তাই, একটু ভাবুন।

নাকি বলব, ভাবুন, ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন! স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. বিষাণ বসু, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে অঙ্কোলজির সহযোগী অধ্যাপক।